স্বপ্নের পৃথিবী রৌদ্রের জীবন

স্বপ্নের পৃথিবী রৌদ্রের জীবন

(জুলিয়াস ফুচিকের রচনার সংকলন)

ভাষান্তর ও সম্পাদনা

সমীর গঙ্গোপাধ্যায়

নয়া প্রকাশ
২০৬, বিধান সরণী
কলিকাতা - ৭০০ ০০৬

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৬০

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ
শ্রীবারীন্দ্র মিত্র
নয়া প্রকাশ
২০৬, বিধান সরণী
কলিকাতা - ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ ঃ
এস. দাস

মূল্য ঃ পনেরো টাকা

সূচীপত্র

··· আবহমানকালের সেই জীবন-জয়ী যোদ্ধারা যাঁরা গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-প্রগতির নিশান কাঁধে নিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত লড়াই করে চলেছেন সর্বাত্মক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে ; স্বপ্নের পৃথিবীর সেই রৌদ্রের সন্তানরা, দেশ-বিদেশের মাটিতে যুদ্ধরত ফুচিকের সেই সহযোদ্ধাদের প্রতি রক্তিম শ্রদ্ধায় এই সংকলন-গ্রন্থটি উৎসর্গ করলাম—

অনুবাদক ও সম্পাদক

অনুবাদকের কথা

চেক্ জনগণের মহান সন্তান জুলিয়াস ফুচিকের পরিচয় নতুন করে দেবার মত কিছু নেই। চল্লিশের দশকের গোড়ায় নাৎসী কারাগার থেকে তিনি যে-মহান রচনা 'নোট্‌স্ ফ্রম্ দি গ্যালোস্' লিখেছিলেন পরবর্তীকালে তা'কেই বাংলা ভাষার পাঠকদের কাছে এক মহান সাহিত্য-দলিল হিসাবে পৌঁছে দিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত অশোক গুহ, 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে' এই শিরোনামে। কিন্তু বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী সেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়া এবং একাধিকবার তা' পুনর্মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও, ফুচিকের আর অন্য কোন লেখা বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়নি। এই অভাবটুকু থেকেই গিয়েছিল। চেক্ জনগণের মহান সন্তান, ফুচিকের বিপ্লবী সংগ্রামী জীবনের পাশাপাশি সমান্তরালে অবস্থিত ছিল তাঁর সাহিত্য-জীবন। তাঁর রচনাবলী চেক্ সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সেই সম্পদের কয়েকটি টুকরোকে এই অনুবাদ-সংকলনে সাজিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি মাত্র, যা'তে বাংলা ভাষার পাঠকদের কাছে ফুচিকের সাহিত্যকর্মকে কিছুটা সংযোজিত মাত্রায় পৌঁছে দেওয়া যায়।

রচনাগুলোর সবক'টিই সংকলিত হয়েছে, ১৯৫৩ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রকাশন-সংস্থা 'আর্তিয়া' কর্তৃক প্রাগ্ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ 'পিপ্‌ল্ বি অন ইওর গার্ড!' নামের ইংরাজী গ্রন্থটি থেকে। ঐ গ্রন্থে সংকলিত রচনাগুলি মূলতঃ সংগৃহীত হয়েছিল 'ভোর্বা', 'রুদে প্রাভো', 'স্তেভ্ প্রেস্' ইত্যাদিতে প্রকাশিত ফুচিকের লেখাগুলোর মধ্য থেকে। ফুচিক ওগুলি লিখেছিলেন ১৯৩৩ সালের অক্টোবর এবং ১৯৩৮ সালের এপ্রিলের মধ্যবর্তী সময়ে। ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে 'ইয়াউ-ডি-কোলনের বোতল' শীর্ষক রচনাটি, যেটি সংগৃহীত হয়েছে 'দি কান্ট্রি হোয়্যার টুমরো ইজ্ ইয়েস্‌টারডে' নামের গ্রন্থ থেকে এবং 'ডক্টর গোয়েবল্‌স্-এর উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি' শীর্ষক রচনাটি, যেটি ১৯৪০ সালের শরৎকালে প্রকাশিত ফুচিকের একটি বেআইনী পুস্তিকা থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ এই সংকলনের অন্তর্গত অন্যতম রচনা, 'চিল্‌ড্ হ্যারল্‌ড্‌স্ পিলগ্রিমেজ্-এর মুখবন্ধে বায়রণ' শীর্ষক রচনাটিকে ফুচিক লিখেছিলেন, কারেল ভোজান্, ছদ্মনামে।

সংকলিত রচনাগুলির সবক'টিই মূল চেক্ থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন এককভাবে ডি. এম. রুসব্রিজ্ অথবা এইচ. কাকজেরোভা।

উল্লিখিত গ্রন্থের অন্তর্গত রচনাগুলির মধ্য থেকে এই সংকলনের জন্য কয়েকটি মাত্র রচনাকে বাছাই করার ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন অংশে সংগ্রথিত করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দ্বারা চালিত হয়েছি। সংকলনের আয়তনকে সীমাবদ্ধ করার প্রয়োজন থেকেই মাত্র চোদ্দটি রচনাকে এই সংকলনে স্থান দিতে পেরেছি।

রচনাগুলিকে তিনটি পৃথক অংশে বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রেও নিজস্ব মতামতকেই গুরুত্ব দিয়েছি। কালানুক্রমিকভাবে রচনাগুলিকে বিন্যস্ত করার পরিবর্তে, রচনাগুলির বস্তুগত উপাদান অনুসারেই মূলতঃ সেগুলিকে তিনটি পৃথক অংশে সন্নিবিষ্ট করেছি।

অনুবাদের ক্ষেত্রে রচনাগুলিকে মূল ইংরাজীতে যেভাবে পেয়েছি যথাসম্ভব সেই মৌলিকত্ব বজায় রাখারই চেষ্টা করেছি। রচনাশৈলীর সঙ্গতি ও অনুবাদের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার প্রয়োজনেই ক্ষেত্রবিশেষে শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাসে অল্পস্বল্প পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জন করেছি এবং তা' কিছুটা নিরুপায় হয়েই করতে হয়েছে।

ফুচিকের জীবন ছিল আপোষহীন সংগ্রামীর জীবন। শোষণ-নিপীড়ন-পরাধীনতা-দাসত্বের শৃঙ্খলমুক্ত এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন ফুচিক। কমিউনিষ্ট মতাদর্শ, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ; সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের প্রতি তাঁর ছিল অনন্ত আস্থা ; ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও প্রগতির স্বপক্ষে তিনি ছিলেন অক্লান্ত যোদ্ধা। সর্বগ্রাসী অন্ধকারের মধ্যেও ফুচিক যাপন করে গেছেন এক রৌদ্রময় জীবন। তাঁর রচনাগুলোর গভীরে সেই স্বপ্নময় পৃথিবী ও রৌদ্রময় জীবনই যেন বাণীবদ্ধ হয়ে আছে। একথা মনে রেখেই এই সংকলন গ্রন্থটির নামকরণ করেছি।

সবশেষে যাঁদের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা ছাড়া এই অনুবাদ ও সংকলন কর্ম সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, সেই বন্ধুবর শ্রীমানিক চক্রবর্তী ও 'নয়া প্রকাশ' সংস্থার শ্রীরঞ্জিত ঘোষকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

—সমীর গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম অংশ

ছ'জন বালকের গল্প

ওপর থেকে তাকালে জায়গাটাকে খুবই ছোট একটা লক্ষ্যস্থল ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না।

একটা ছোট গর্ত আর তার চারধারে আধ ডজন বাচ্চা ছেলে। তারা খেলছিল রঙীন মটরশুঁটি নিয়ে। যুদ্ধ হয়ত অনেক কল্পনা অনেক কিছুকেই মুছে দিতে পেরেছিল, কিন্তু কিছুতেই খেলাধুলো থেকে বাচ্চাদের সরিয়ে রাখতে পারেনি।

হার ঝুঙ্কারস্ এর লক্ষ্যভেদটা বেশ ভালই হয়েছিল।

বোমাটা ঠিক ঐ বাচ্চাদের জটলার মধ্যেই পড়েছিল।

লোকজনেরা তাদের ঘরদোর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। আর যখন তারা ঐ ছেলেগুলোর ক্ষতবিক্ষত দেহগুলোকে জড়ো করছিল, তখন তাদের রক্তিম চোখগুলো কোটরে গভীর থেকে আরও গভীরে বসে যাচ্ছিল। তারা সেই দেহ-গুলোকে বয়ে নিয়ে গিয়ে সেই ইস্কুল বাড়ীতেই রেখেছিল, যেখান থেকেই কিছুক্ষণ আগেই ঐ বাচ্চারা সেখানে এসেছিল প্রাণের প্রাচুর্য ও খেলার উচ্ছলতা নিয়ে।

একজন সরকারী ফটোগ্রাফার এসেছিলেন আর কোন রকমে ঐ বীভৎসতার দলিল-চিহ্নটাকে তিনি ক্যামেরায় তুলে নিয়ে ছিলেন। তবে ঐ দৃশ্যের ভয়াবহতা তাঁর ফটোগ্রাফির দক্ষতাকেও অকেজো করে দিয়েছিল।

তিন দিন যেতে না যেতেই চিত্র-দলিলটা বিমানযোগে গিয়ে পৌঁচেছিল প্যারিস, লণ্ডন ও প্রাগে। ফটোগ্রাফারের ডার্করুম থেকে খবরের কাগজের প্রথম পাতাতেই মুক্তি পেয়েছিল সেই দৃশ্য—আর লোকজনেরা হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে পড়েছিল সেই দৃশ্যটার ওপর ; মনে হচ্ছিল এলগুয়ের চোখ দিয়েই যেন তারা তাকিয়ে ছিল দৃশ্যটার দিকে।

তখন বসন্তকাল।

কয়লার গাদার পেছনে একটা নিঃসঙ্গ গাছ ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছিল। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন স্মিচভ্ শহরতলীর বুক চিরে একফালি আলোর রেখা সেই গর্তটার দিকে পথনির্দেশ করছিল, যেটা খেলাধুলো করবার জন্যে বাচ্চাদের সব সময়েই হাতছানি দিয়ে ডাকত। প্রাগের সমস্ত জায়গার মধ্যে ঐ জায়গাটারই এক বিশেষ গুরুত্ব ছিল। কবিরা যেভাবে কবিতার ছন্দ খোঁজেন অনেকটা সেইভাবেই ছ'জন ছেলেও নানা কথা ভাবতে ভাবতে ধুলো ঢাকা বাতাসের মধ্যে দিয়ে পথ করে সেখানে চলে এসেছিল। জায়গাটা ছিল পরিত্যক্ত, এমন কি শিক্ষকমশাইরা ভুল করেও কখনও সেখানে আসতেন না। লরি-চালকরা এখানে কাদার রাস্তাটাকে ক্রমেই এক আশ্চর্যজনক সমতলভূমিতে মিশিয়ে দিয়েছিল, যেখান বরাবর নুড়ি পাথরগুলো বিনা প্রতিরোধেই গড়াতে থাকত। আর প্রকৃতির নিয়মে ঐ কয়লার গাদার তলা থেকে একগুচ্ছি ঘাসও সেখানে গজিয়ে উঠেছিল, আর তা' যেন মনে করিয়ে দিচ্ছিল কোনও জঙ্গল অথবা দূরের কোন দেশের সুগন্ধের কথা, যার উদ্দেশ্যে সেই সাহসী ক্যাপ্টেন কোরকোরান পাড়ি দিয়েছিলেন তার জাহাজে। ওটা ছিল এমন একটা জায়গা যেখানে যে-কেউ যুদ্ধ বা স্বপ্ন নিয়ে মেতে থাকতে পারত অথবা খেলার প্রচণ্ড প্রেরণায় জিত্‌তে বা হারতে পারত রামধনুর রঙে রঙীন একটা মার্বেল।

কিন্তু আমরা যেদিনের কথা বলছি, সেদিন কিন্তু ঐ ছ'জন বালকের কেউই সেরকম কোন কিছুর জন্যেই ঐ কয়লার গাদায় আসেনি। যুদ্ধ, স্বপ্ন বা খেলাধুলো কোনটাই তাদের মাথায় ছিল না। এমন কি যত্ন করে খোঁড়া হাঁ-করে-থাকা গর্তটার দিকে একবারের জন্যে তারা ফিরেও দেখেনি। পথের প্রান্তে তারা বসেছিল, পেছনে ছিল সদ্য গজিয়ে ওঠা সেই দুঃসাহসী ঘাসের গুছিটা, আর তাদের মাথাগুলো ছিল পরস্পরের খুব কাছাকাছি।

ফ্রান্তা তার খাতাটা একবারের জন্য খুলল আবার বন্ধ করল; আর তার বাবার ভঙ্গীতে খবরের কাগজটাকে মেলে ধরল। খবরের কাগজ থেকে একটা শিশুর মুখ তাদের দিকে তাকিয়ে রইল—শিশুটার কপালটা বোমায় উড়ে গেছে।

এলগুয়ের বালক!

অ-শিশুসুলভ ভঙ্গীতে খুব আস্তে আস্তে ফ্রান্তা পড়ে চলেছে। পড়ে চলেছে এলগুয়েতে বোমা ফেলার কথা, ফ্যাসিস্ত বর্বরতার বিষয়ে নানা মতামত, প্রতিবাদের জন্যে আবেদন ও সক্রিয় সংহতি প্রসঙ্গে নানা খবরাখবর।

বানান করে থেমে থেমে সে যা' কিছু পড়ছে, তারা যে সেই সব কথার সব-কিছু বুঝছে এমন নয়, তবে তারা সেগুলোকে নিজেদের বক্তব্যের মত করে সাজিয়ে নিচ্ছে—ওরা ছিল এলগুয়ের বালক আর তাদেরই মত ওরা ইস্কুল থেকে সোজা চলে গিয়েছিল সেই কয়লার গাদায় মার্বেল আর মটরশুঁটি নিয়ে খেলা করতে এবং এলগুয়ের সেই কয়লার গাদার পাশে ঠিক সেখানেই মৃত্যু তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

আশঙ্কার দৃষ্টিতে ওপরে চোখ তুলে তারা তাকাল। মাথার ওপরে আকাশ দিয়ে ভেসে চলেছে বসন্তের মেঘপুঞ্জ। কিন্তু, না, সেখানে কোন শত্রুরই চিহ্ন নেই। এই কল্পনায় তারা তাদের চোখগুলো কোঁচকাল যে হয়ত তারা তাকে দেখতে পাবে। হয়ত ড্রাগনের মত তার অনেকগুলো মুখ- মোটা, সরু, আবার এদের সংমিশ্রণে নানা রকম। আর সেই মুখগুলোর একটা থেকে অন্যটাকে তারা আলাদা করতে পারছিল না। তবে আর যাই হোক, এ তো সেই শত্রু ছাড়া আর কেউ নয়, সেই ভয়ানক শত্রু, যে এলগুয়ের বালকদের হত্যা করেছিল। আর সেই এলগুয়ের বালকেরাই সেই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে তাদের কাছে সাহায্য চাইছে।

কি সাহায্য তারা করবে? কি বা তারা করতে পারে!

প্রশ্নটা যে শুধুমাত্র ঐটুকুই ছিল না, ফ্রান্তা পড়া শেষ কবার আগেই তারা সেটা জানত।

আমার ভাই স্পেনের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে···স্বেচ্ছাসৈনিক···'', নম্রভঙ্গীতে কথাগুলো বলে ফেলল রুদা।

তারাও এ ব্যাপারে ভেবেছিল। স্বপ্নের মত সুন্দর ব্যাপার। কিন্তু সাহায্যের ব্যাপারটা ?

"তুমি তো গুলি ছুঁড়তে জান না", ফ্রান্তা বাধা দিল।

কথাটা ঠিকই, তবে এটাও ঠিক যে একদিন না একদিন তারা সেটা শিখতে পারবে। কিন্তু সাহায্যের ব্যাপারটা তো আর দেরী করা চলে না। খবরের কাগজগুলোতে প্রকাশিত আবেদন অনুযায়ী খুবই তাড়াতাড়ি সাহায্য দরকার, এক্ষুণি দরকার।

তবে কেমন করেই বা তারা সেটা করতে পারে ?

খবরের কাগজটার দিকে তাকিয়ে থাকে তারা, কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পারে না। তবে নিশ্চিতভাবেই উপায় তো একটা থাকতেই হবে, আর তা' নিশ্চয়ই এই কাগজেরই কোথাও থাকবে।

খুবই উল্লসিত হয়ে একটা অনুচ্ছেদের দিকে সবাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ফ্রান্তা ঃ "স্পেনীয় জনগণের জন্যে সাহায্য সংগ্রহ।"

খবরের কাগজটার স্তম্ভ জুড়ে পাঁচ, দশ, পঞ্চাশ, একশ' ক্রাউন সাহায্যের দীর্ঘ তালিকা। সেইসব সাহায্য এসেছে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যাতে করে একটা যুক্ত সাহায্য তহবিল গড়ে তোলা যায় ··· ।

পথের ধারে বসেই ছ'জনের পকেটে যা পয়সাকড়ি ছিল সবটাই বার করে তারা জড়ো করল। না, সব মিলিয়ে আধ ক্রাউনও হোল না।

"বড্ড কম !"

কাগজটার দিকে আবার তারা তাকায়। না, কেউই অত কম দেয়নি। সত্যি, এটা কোন একটা সাহায্যই হতে পারে না।

"আগামীকাল আমি নিয়ে আসব ···"

"অনেক দেরী হয়ে যাবে যে ···"

কে জানে, আগামীকালের মধ্যেই কত কি ঘটে যেতে পারে, হয়ত এই দেরী করার জন্য এলগুয়ের আরও কত বালককে হারাতে হবে। না, না, কালকে নয়। আজকেই কি হতে পারে না ··· ?

হতাশা মাখা তাদের চোখগুলো প্রকৃতির বিরাট অঞ্চলের ওপর ঘুরে বেড়াতে থাকল। যদি এখানে কোথাও একটা ব্যাঙ্ক-নোট পড়ে থাকত, আহা ! কি দারুণই না হোত ! আর এরকম তো হতেই পারে। ধর, কেউ চলার পথে কিছু টাকাকড়ি

ফেলে গেল, তাহলে কাজটা কি সহজই না হয়ে যায় !

না, রাস্তার ওপর কোন ব্যাঙ্ক-নোট পড়ে নেই।

ছ'টা বাচ্চার মাথায় কি কঠিন চিন্তা ! সব কিছুকে তারা তালগোল পাকিয়ে ফেলছিল আর নানা কল্পনার স্রোতে একেবারে ভেসে চলেছিল।

আন্তেনিন্ হঠাৎ বলে উঠল : "আমি···", একটু দ্বিধার সংগে সে বলল, "···আমার একটা পেন-নাইফ্ আছে।"

আর এটাই তাদের চিন্তাস্রোতের গতিমুখটাকেই ঘুরিয়ে দিল।

"একটা পেন-নাইফ্ দিয়ে তুমি কিছুই করতে পারবে না।"

কথাটাতে বেশ খানিকটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠল। মনে হোল আন্তেনিন্-এর পেন-নাইফ্টা একটা ঈর্ষা করার মত সম্পদ ; মনে হোল এটা যেন একটা সম্মানসূচক তরবারি, যা' ছুঁয়ে তারা সবাই শপথ নিতে পারে।

"হয়ত আমি পারব না। কিন্তু যদি আমি এটাকে বিক্রি করি ?"

পাঁচ জোড়া চোখের অবিশ্বাস্য চাহনি আন্তেনিন্-এর ওপর আটকে রইল। পেন নাইফ্টাকে আন্তেনিন্ বেচে দেবে—তার সমস্ত সম্পদটাকে সে বেচে দেবে !

সম্পদ, কিসের সম্পদ ? আন্তেনিন্ তো সেভাবে ভাবছে না।

তারা সবাই বুঝল। ফ্রান্তা গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়াল, তারা সবাই উঠে দাঁড়াল। আন্তেনিন্-এর হাতটাকে ফ্রান্তা এমন উষ্ণতা নিয়ে চেপে ধরল, যা' শুধুমাত্র বালকেরাই পারে আর বিপদের মুহূর্তে পারে বড়রা।

তারপর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে আন্তেনিন্-এর পেন-নাইফ্-এর পাশে ফ্রান্তা মাটিতে রাখল তার বুট-পালিশের টিনটা, যে টিনটাকে সে কখনও ব্যবহার করত পোকামাকড়ের আস্তানা হিসেবে, কখনও বা ঘড়ঘড় শব্দ করে চলা খেলনা-ট্রেন হিসেবে, কখনও বা ভলগার তীর ঘেঁষে ভেসে চলা স্টীমার হিসেবে। এটা হয়ত আন্তেনিন্-এর পেন-নাইফ্টার মত অতটা দামী নয়, কিন্তু এটার সঙ্গে মিশে রয়েছে ফ্রান্তার জীবন-ইতিহাসের একটা টুকরো।

শেষ বারের মত তেরটা মার্বেলকে হাতে ঘষে নিল রুদা এবং সেই তালিকায় যোসেফ যখন তার পেনী-হুইসিল্টাকে যোগ করল, তখন রুদা একটু লজ্জা পেল। আর তক্ষুণি আরও চোদ্দটা মার্বেলকে সে যোগ করে দিল, তার মধ্যে সেই সীসের মার্বেলটাকেও দিয়ে দিল, যেটা দিয়ে রুদা সব সময়েই জিত্তো।

ছ'জোড়া পকেটকে ঢেলে একেবারে উপুর করে দিল তারা। একসঙ্গে জড়ো না করে সযত্নে পথের ধারে পরপর তারা শুইয়ে রাখল ঐ ছ'জন বালকের যা' কিছু সবচেয়ে কাছের সবচেয়ে প্রিয় : একটা পেন-নাইফ্, একটা বুট-পালিশের

টিন, একটা পেনী-হুইসিল্, কয়েকটা মার্বেল, সুতো, একটা চাক্, চামড়ার ব্যাগের মত দেখতে কাগজের তৈরী জীর্ণ একটা পয়সা রাখার ব্যাগ, একটা ইস্ক্রুপের মাথা, একটা গুল্‌তি, ফুটবল খেলোয়াড় প্লানিকার একটা ফটোগ্রাফ্ যার ওপর কাঁচা হাতে খোদাই করা তার একটা সইও রয়েছে, এবং আরও কত কি, যেগুলো কি কাজে লাগে তা' তুমি নিজেই জান না এবং যখন তুমি আর বালক থাক না তখন তুমি তাদের নামগুলোও ভুলে যাও। ছ'জন বালক ছ'জোড়া চোখ দিয়ে সেই ঐশ্বর্যগুলোকে আর একবারের মত ওজন করে নিল এবং তারা নিজেদের আর নিঃস্ব ভাবল না। তাদের মুখের আদলে ও চালচলনে গাম্ভীর্য এনে ওগুলোকে বিক্রি করার কাজের জন্য ফ্রান্তা ও আন্তেনিন্‌কে তারা নির্বাচিত করল।

ভ্লাদ্‌ভা নদীর ডান তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা সেই পুরোনো শহরের আঁকা-বাঁকা অলিতে গলিতে এখনও তুমি দেখতে পাবে পুরোনো জিনিষপত্তরের দোকান। দালালদের সংগঠিত উৎপাত্ সত্ত্বেও সেগুলো এখনও টিকে রয়েছে। সেখানে, "ইহুদিদের কাছে" গরীব লোকজনেরা তাদের দারিদ্র্যের যা' কিছু সম্বল তাই নিয়ে আসে, আর যদি ওগুলোর বদলে সামান্য কিছু পাওয়া যায় তাই দিয়ে সেই দারিদ্র্যের বোঝাকে একটু হাল্কা করতে চায়।

পাথর বাঁধানো রাস্তাটা ও সেতুটা তারা পেরিয়ে চলল অভিভাবকসুলভ ভারিক্কী পদক্ষেপে। অদৃশ্য পদচিহ্ন ফেলে ছ'জন বালক এগিয়ে চলল। তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে উদাসীন জনস্রোত, সম্ভবতঃ তারা বুঝতে পারছে না যে তারা পাশ দিয়ে পেরিয়ে চলেছে বিজয়গর্বে উজ্জ্বল এক শোভাযাত্রাকে। (কে জানে, তাহলে হয়ত অনেকেই টুপী খুলে তাদের অভিনন্দন জানাবে।)

সবাইয়ের সামনে চলেছে ফ্রান্তা ও আন্তেনিন্ আর শক্ত হাতে ধরে রেখেছে পকেটে আবদ্ধ সেই ঐশ্বর্যকে।

আর ঠিক দশ পা পেছনে চলেছে বাকী চারজন। চার জোড়া চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করছে সামনের দু'জনকে। একই সঙ্গে চলেছে সকলে—যাদের প্রতি সম্মান দেখানো হচ্ছে তার এবং যারা সেই সম্মান দেখাচ্ছে, উভয়েই। তারা প্রায় না খুঁজেই পেয়ে গেল বুড়ো আইজ্যাকের দোকান।

সম্মান প্রদর্শনকারী চারজনই প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে গেল। চারিদিকে ছড়ানো তেলচিটে লাউঞ্জ স্যুট ও জীর্ণ-বিবর্ণ শ্রমিকদের জামাকাপড়ের স্তূপের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল ফ্রান্তা ও আন্তেনিন্। তাদের বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করতে থাকল, কিন্তু তারা সেটা কাউকে বুঝতে দিল না, কারণ তারা জানে যে তাদের কমরেডদের চোখ তাদের ওপরই রয়েছে।

কাউন্টারের পেছনেই বসে রয়েছে বুড়ো আইজ্যাক্‌।

নিঃশব্দে তার সামনে তারা এক এক করে রাখল টিনটা, পেনী-হুইসিল্‌টা, সুতোটা, মার্বেলগুলো এবং সবশেষে আন্তেনিন্‌-এর পেন-নাইফ্‌টা। তারা তাদের চোখগুলোকে বুড়োর মুখের ওপর একেবারে স্থির করে রাখল। তাদের সেই দৃষ্টিতে মার চোখের ভয়-পাওয়া চাহনি অথবা বাবার চোখের অকার্যকর জেদের চাহনি কোনটাই ফুটে উঠল না ; ফুটে উঠল কোন কিছু জয়ের এক আশ্চর্য আনন্দ।

বালকদের সেই সব মূল্যহীন জিনিষগুলোর দিকে তাকালো বুড়ো আইজ্যাক্‌ আর এগুলোকে সেখানে আনার অর্থটা ঠিকমত বুঝে উঠতে না পেরে সোজাসুজি চেঁচিয়ে উঠল সে ঃ "এগুলো নিয়ে আমি করবটা কি ?"

বুড়ো নিশ্চয়ই খুব তাজ্জব বনে গেছে এবং এটাই তাদের কাছে আত্মপ্রশংসার মত মনে হোল। এক ঝট্‌কায় এটা নিশ্চয়ই অনেকখানি পাওয়া।

"এগুলো দিয়ে আমি কি করব ?" সে আবার চেঁচিয়ে উঠল।

"পাজী ছেলেরা, যা বেরিয়ে যা', এক্ষুণি বেরিয়ে যা।"

আরে ! বুড়ো বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝতেই পারছে না ; সে নিশ্চয়ই ভাবছে, যে তারা ঠাট্টা করছে।

গাম্ভীর্যের বোঝাটা ফ্রান্তা আর বেশীক্ষণ বইতে পারল না ; বলে উঠল ঃ "সবটা, সবটাই বিক্রির জন্য।"

বুড়ো আইজ্যাক্‌ লোক চেনে। শুধুমাত্র গলার স্বর শুনেই সে বলে দিতে পারে যে লোকটা দর কষাকষি করবে কিনা, লোকটা তার দেওয়া দামই মেনে নেবে কিনা, লোকটা এই প্রথম এলো কিনা, লোকটা দ্বিতীয়বার এলো কিনা এবং সেরকম লোক সম্পর্কে সে এও বলে দিতে পারে যে একবার ফেরৎ গেলে লোকটা আর কখনও ফিরে আসবে না, কারণ ওধরণের লোক ক্ষুধায় মরে যাবে তবুও তার জীর্ণ কোটটাকে বিক্রি করবে না। ফ্রান্তার গলার স্বর তার কাছে অন্য রকম শোনালো। আগে সে কখনও এরকমটা শোনেনি। আর যদি সে নিজে অতটা বুড়ো না হোত তাহলে হয়ত এতে সে উত্ত্যক্তই হোত। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে বেশ আকর্ষণীয় অথচ অদ্ভুত কিছু একটা বলে মনে হোল। ছেলেগুলো আসলে করতে চায়টা কি ? —সিগারেট টিগারেট কিনবে না কি ··· ?

ফ্রান্তা অপমানিত বোধ করল। বলল, "না, সিগারেটের জন্য নয়।"

"তাহলে সিনেমার জন্য নিশ্চয়ই।"

কণ্ঠস্বরে বিরক্তির তিক্ততা মিশিয়ে ফ্রান্তা বলল, "না, সিনেমার জন্যও নয়।" এবং সে ভাবল তাদের ভুল বোঝা হচ্ছে।

সে বলে ফেল্ল, "স্পেন, স্পেনের জন্য।"

সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেল।

জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সূতো আপনা থেকেই খুলে যেতে থাকল আইজ্যাকের মাথায়। ফ্রান্তা নিজেকেই অভিশাপ দিতে থাকল, আন্তেনিন্-এর দিকে তাকাতে তার আর সাহস হোল না। বেঁচে থাকতে সে বুড়ো ইহুদিটাকে ওকথাটা বলতে গেলই বা কেন! বুড়োর কাছে, এসবের মূল্যই বা কি? হয়ত সে পুলিস ডেকে আনবে। হয়ত তাদের এই সম্পদের সবটাই বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে; আর এলগুয়ের বালকদের সাহায্য করার কাজটাই ধুলোয় যাবে। সে এ কি করল! সন্তর্পণে কাউন্টারের গা ঘেঁষে দাড়ালো ফ্রান্তা, যদি কিছু অন্ততঃ বাঁচানো যায় ···

আইজ্যাক্ ঝট্‌তি উত্তর দিল, "আচ্ছা, তাই হবে।"

ফ্রান্তার টিনটাকে তু'লে নিল সে, আর অনেকক্ষণ ধরে নেড়ে চেড়ে দেখল। আর এই দু'জন প্রতিনিধির চোখগুলো থেকে বেশী বেশী করে ঝড়ে পড়তে থাকল ওকালতিসুলভ আকাংক্ষা।

"তা' তো হোল" আইজ্যাক্ ঘোঁৎঘোঁৎ করতে করতে কথাগুলো বলে চলল, "টিনটা খারাপ নয়, কিন্তু আমি দু' ক্রাউনের বেশী দেব না ···"

আন্তেনিন্-এর পেন-নাইফ্‌টাকে হাতে নিয়ে বালক দু'টোর দিকে বেশ প্রশংসার ভঙ্গীতে তাকিয়ে সে বলল, "···এবং এটা বেশ একটা কাজের নমুনা ··· সুতরাং···তোমরা বলছিলে না স্পেনের জন্যে! ···ভারী সুন্দর কাজের নমুনা এটা···আমি পাঁচ ক্রাউন দেব ভাবছি ··· ।"

প্রতিনিধিরা রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল। তারা স্বপ্ন দেখতে থাকল যে তারা জয়ী হয়েছে, যে জয় তারা এলগুয়ের জন্য বহন করে আনছে···অনেক, অনেক টাকাকড়ি।

বুড়ো আইজ্যাক্ খুব ভেবেচিন্তে একটা একটা করে ওগুলোর দাম ঠিক করতে থাকল···সূতোটার দাম, চাক্‌টার দাম, রুদার সীসের মার্বেলটার দাম ··· ।

তারপর খুচরো পয়সায়, যাতে সংখ্যার পরিমাণটা একটু বেশী হয়, এভাবে গুণে গুণে সে কাউন্টারের ওপর রাখল কুড়িটা ক্রাউন।

যে লোকটি ইলেক্‌ট্রিক বাল্ব দিয়ে নৈশভোজ সেরেছিল

বেলা বেশ ফুরিয়ে এসেছে।

পুরোনো শহরের ঘিঞ্জি এলাকার ওপর এসে পড়েছে গোধূলির আলো এবং গির্জার অন্ধকার পটভূমিকে পেছনে রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে একদল লোক। আশ্চর্যজনকভাবে নীরব ও নিশ্চল সেই দলের এক ভৌতিক দৃশ্য আমার দৃষ্টিকে আড়াল করে দাঁড়াল। না, আমি আর এগুতে পারলাম না।

একটা মানুষের মুখ আর তাই থেকে বেরুচ্ছে আগুনের প্রজ্বলিত শিখা।

একজন বৃদ্ধা, যিনি আমারই সামনে পথ ধরে এগিয়ে আসছিলেন, তিনি এক মুহূর্তের জন্যে থামলেন, চম্‌কে তাকালেন ও আতঙ্কে বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন।

"প্রভু! আমাদের রক্ষা করো।"

তক্ষুণি শোনা গেল হুইসিলের একটা তীব্র শব্দ।

সেই ভৌতিক দৃশ্যটা মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

পড়ে রইল শুধু গোধূলির আলো, পুরোনো শহরের সেই ঘিঞ্জি এলাকা ও গির্জার অন্ধকার পটভূমি···

* * *

এক সপ্তাহ পরে আবার একই ধরণের একটা দলকে আমি দেখতে পেলাম। সময়টা ছিল অপরাহ্ণ। আকাশে ছিল উজ্জ্বল সূর্য আর সেই সূর্যের আলোয় সমস্ত বিস্ময়ই মুছে গেল। ঘটনাটা পুরোনো শহরের ঘিঞ্জি এলাকায় গোধূলির আলোয় ঘটছিল না, ঘটছিল প্রাগের ফ্ল্যাট্‌ বাড়ী এলাকায়, হাল আমলের বাড়ীঘর ঘেরা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে যানবাহনের নিরন্তর প্রবাহের মাঝে আশ্চর্যজনকভাবে যে শান্ত অঞ্চলগুলো রয়েছে, তারই একটাতে। সারি সারি ট্রাম সরীসৃপের মত এগিয়ে চলছিল, গাড়ীগুলো দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছিল, লোকজনেরাও খুবই দ্রুত পথ চলছিল এবং এরই মাঝে একদল লোকের ভীড়ের মাঝ থেকে একটা কণ্ঠস্বর রাস্তার সমস্ত শব্দকে ছাপিয়ে বেজে উঠল:

"ভেল্কি ব্যাপারটা কি, তা' আমি আপনাদের বলতে পারি। কিন্তু এটা কোন ভেল্কির ব্যাপার নয়, এটা একটা কঠিন খাটুনির ব্যাপার। কেউ যদি চান,

চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি চুক্তিবদ্ধ থাকব, ততক্ষণ আমি এটাকে শয়তানের নৈশভোজই বলব। ঘরের ভেতরে এটা করা অবশ্য অনেক সহজ। এখানে বাতাস বইছে আর আমার চোখ দু'টো পুড়ে যেতে পারে। তবে নিজের জিভের ব্যাপারে আমি ভয় পাইনা। অনুগ্রহ করে কেউ চলে যাবেন না, তাহলে আমাকে একা একাই নৈশভোজ সারতে হবে।"

দেখা গেল, জ্বলন্ত রুটির টুকরো একটু একটু করে ঐ তরুণ বক্তার মুখের মধ্যে ঢুকে যেতে লাগল। আগুনের প্রজ্বলিত শিখা মুখের ভেতর থেকে বাইরে লক লক করতে থাকল। এই অগ্নিশিখাই ঠিক এক সপ্তাহ আগে অতটা রহস্যময় হয়ে উঠেছিল। আর এখন দেখা যাচ্ছে এটা আসলে একটা কাজমাত্র, তবে দারুণ কঠিন কাজ। তুমি দেখতে পাও কি কঠিন পরিশ্রমই না করতে হয় তরুণটিকে। তার মুখ ক্রমেই রক্তিমাভ হয়ে উঠতে থাকে, রগের শিরাগুলো ফুলে স্ফীত হয়ে উঠতে থাকে আর চোখ দু'টো জলে ভরে ওঠে।

"না, না, এ মোটেই সুস্বাদু নয়। কিন্তু, আমি যদি আগুন না গিলি তবে আমি আর কোন কিছুই গিলতে পারব না। আমি একজন শিল্পী, কিন্তু পুরোপুরি বেকার। যদি কেউ দয়া করে কিছু দেন ··· আমি জানি আপনাদেরও বেশ কঠিন সময়ই চলেছে, তবুও আপনি হয়ত একটা কপার খরচ করতে পারবেন ·· ।"

টিনের একটা থালা হাতে নিয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনদের ঐ ছোট্ট ভীড়টাকে সে একটা চক্কর দিল। থালাতে পড়ল কয়েকটা কুড়ি হেলারের টুকরো এবং মনে হোল বোধহয় একটা ক্রাউন টক্ করে আওয়াজ করল—সে দ্বিতীয়বারের খেলা শুরু করল।

"শুধুমাত্র পেরেকগুলোকে একটু পরখ করে দেখুন। দেখুন না। লজ্জা করবেন না, দেখুন। এগুলো খুব শক্ত, তাই না? এগুলো ভাঁজকরা পেরেক নয়, —এক্কেবারে সাদামাটা পনের সেন্টিমিটার লম্বা পেরেক ···"

পেরেকগুলোকে এবার সে নাকের ছিদ্রের মধ্যে গেঁথে দিতে থাকল, এমনকি সেগুলোর ওপর এমনভাবে হাতুড়ি পিটতে থাকল যে মনে হোল সে যেন কাঠের গুঁড়িতে পেরেক পুঁতছে।

"এখন আমি অবশ্য হাসতে পারি, কিন্তু আমি যখন শিখতাম, তখন আমি কাঁদতাম। আমার বাবা সবসময় বলতেন, যদি কাউকে বেঁচে থাকতে হয়, তবে এসব তাকে শিখতেই হবে। আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ··· আমি বেঁচে রয়েছি, বেঁচে থাকতে পারছি। আমার বাবা ছিলেন একজন ট্রিক-জাম্পার। কাজ করতেন ক্লুড্স্কিতে। একদিন ঘোড়াটা বেমক্কা ছুটতে শুরু করল, তিনি আর

ঠিকমত ঝাঁপ দিতে পারলেন না। হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই বাবা মারা গেলেন। আর আমি পড়ে রইলাম নিঃসঙ্গ একা। আমার বয়স তখন সবেমাত্র ষোল। যা জানতাম আমি তাই অনুশীলন করতে শুরু করে দিলাম। এক্ষুণি··· আমার তালিকায় আর যা আছে এক্ষুণি তার থেকে আমি আর একটা দেখাব।''

তরোয়ালের এক দীর্ঘ ফলা সূর্যালোকে ঝক্ ঝক্ করছিল।

''যদি কেউ মনে করেন, এটা ছুঁয়ে দেখতে পারেন। নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন না। এই ষাট সেন্টিমিটার দীর্ঘ তরোয়ালটাকে আমি নিজের গলার মধ্যে গেঁথে দেব।'' সে করলও তাই। ''···আর আপনারা যদি আমার এই জায়গায় থাকতেন, তাহলে আপনারা এর তীক্ষ্ণ শীর্ষটাকে পাকস্থলীর গভীরে অনুভব করতেন। অবশ্যই এটাও একটা অদ্ভুত খাদ্য, মোটেই পুষ্টিকর নয় ···। আমার নিজের পেট ভরাবার জন্যে আমার তালিকা থেকে আপনাদের আর একটা দেখাব।''

যে বাল্বগুলো তার পায়ের কাছে স্তূপীকৃত পড়েছিল, তার মধ্যে থেকে সবচেয়ে বড়টাকে সে তুলে নিল।

''আমি হলাম গোটা চেকোশ্লোভাকিয়ার একমাত্র ব্যক্তি যে কাঁচ খেতে পারে। এক সময় অবশ্য আরও একজন ছিল, কিন্তু অপর ব্যক্তিটি খুবই অল্পদিন হোল মারা গেছে। সে কোনও কাজই জোটাতে পারেনি, ফলে প্রয়োজনীয় প্যারাফিন সে জোগাড় করতে পারত না। আর যে প্যারাফিন না খেলে এটা কখনও করা যায় না। ফলে কাঁচ তার নাড়ীভুঁড়ী ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলেছিল। তাই আমিই একমাত্র হিসেবে থেকে গেলাম ···''

বাল্বে সে একটা কামড় বসাল। যেন বেশ খুশী মনেই মুচমুচ করে চিবোতে থাকল, আর টুকরোগুলোকে এমনভাবে গিলতে থাকল যেন সেগুলো বেশ সুস্বাদু খাবারের টুকরো। এভাবেই সে একটা বাল্ব খেয়ে ফেলল, তারপর দ্বিতীয়টা খাওয়া শুরু করল।

''এই হচ্ছে আমার মধ্যাহ্নভোজ! খেলা দেখাবার আগে আমাকে উপোসে থাকতে হয় কারণ কাঁচের জন্যে পাকস্থলীটাকে একেবারে পরিষ্কার খালি করে রাখতে হয়···এখন অবশ্য এটা আমার কাছে একটা সহজ ব্যাপার···আর তাছাড়া খেলা দেখাবার আগেই হোক বা পরেই হোক, সাধারণতঃ এটা খালিই থাকে। আমি দৈনিক ছ'টা থেকে আটটা বাল্ব খেয়ে থাকি এবং এই যথেষ্ট। আর যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন, তাঁদের কেউ যদি আমাকে আর একটু কিছু দেন, তাহলে আরেকটু তৃপ্তিদায়ক অন্য কিছু দিয়ে মধ্যাহ্নভোজটা সারতে পারি ···''

"আর এটা দেখিয়েই আমাকে চলে যেতে হবে। তা' বেশ ভালই হোল··· কিন্তু আর নয়···কারণ জ্বলন্ত জিভ্, পাকস্থলীতে চালান করে দেওয়া একটা তরোয়াল এবং দু'পাটি দাঁতের মাঝে বাল্বগুলোকে নিয়েই আমাকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হচ্ছে, যদি আশে পাশে কোথাও একজন পুলিশ থাকে। পুরোনো শহরে আমাকে তো প্রায় একটা চোখই হারাতে হয়েছিল। যদিও এ জায়গাটা একটু ভাল। তিন তিনটে পুলিশ থানার একটা সাধারণ সীমান্তরেখায় এই জায়গাটা। আর সেজন্যেই এখানে কেউ আসছে না—সম্ভবতঃ প্রত্যেকেই তার নিজের সহৃদয়তার ব্যাপারটা অন্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। আর এটা ? ঠিক তারাও মানুষ ; আবার এমনও হতে পারে যে এসব করতে করতে তাদেরও ক্লান্তি এসে গেছে ··· ।"

"আপনারা যদি এটাকে একটা তুচ্ছ ব্যাপারই মনে করেন···তাহলে আপনি নিজেই দেখতে পারেন, যে সব কিছুই খুবই খোলামেলা, কৌশলের কিছুই নেই, ভেল্কিরও কিছু নেই···তবুও আমি জানি···দিনকাল বড়ই কঠিন।"

"এবং এমনও হতে পারে যে আপনাদের মধ্যেই এমন কেউ কেউ রয়েছেন যাঁরা আমাকে হয়ত ঈর্ষা করবেন এই ভেবে যে আমি বাল্ব দিয়েও মধ্যাহ্নভোজটা অন্ততঃ সারতে পারি ··· ।"

খনিগর্ভের মানুষ ও মাটির ওপরের জনগণ

বাস্‌কা থেকে ফ্রাইদেক্‌ যাবার রাস্তাটা গোলাপী আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছিল।

দীর্ঘ পথচলা ও আলোচনার ক্লান্তি নিয়ে এক খনিমজুরের কুটীরের দরজার সামনে বসেছিলাম আমরা। কমরেডের স্ত্রী এক গ্লাস টক দুধ নিয়ে এলো। পরক্ষণেই তার কণ্ঠে ফেটে পড়ল আতিথেয়তার উচ্ছ্বাস ঃ "আর কতদিন চলবে ?"

চার্লস্‌ ফাউণ্ড্রীর কথাই বলছিল সে। ওস্ত্রোভা অঞ্চলের লোকেরা চার্লস্‌ ফাউণ্ড্রীর ধর্মঘটীদের সমর্থনে স্ট্রাইকে নেমেছে। ঐ অঞ্চলের সবাই এটা বুঝে ফেলেছে যে শুধু চার্লস্‌ ফাউণ্ড্রীই নয়, গোটা এলাকার সমস্ত শ্রমিকের ভাগ্যই আজ বিপন্ন। তবে তারা সময়মত সবাই উঠে দাঁড়ায়নি। এখন হাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময়, আর এর মধ্যেই যা' ঘটার সবকিছুই ঘটে যাবে। ডিরেক্টর পুলিশের এক বাহিনীকে প্রস্তুত করেই রেখেছে; আমদানি করেছে লরী লরী ধর্মঘট-ভাঙ্গিয়েদের। ইতিমধ্যেই এক ডজন পুলিশ ও দু'জন ধর্মঘট-ভাঙ্গিয়ে লরীতে চেপে মজুর বস্তীর মধ্যে দিয়ে কারখানার গেটের বাইরে অন্তর্হিত হয়েছে। তবে কাজ করার জন্যে তারা সেখানে থামেনি ; কারণ, ধাতুর তার টেনে লম্বা করার কোন কৌশলই তারা জানে না। তাদেরকে ভাড়া করে সেখানে নিয়ে আসা হয়েছে শুধুমাত্র একটা আবহাওয়া তৈরী করবার জন্যে—পরাজয়ের আবহাওয়া।

অন্যদিকে, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সেক্রেটারীরা লেগে পড়ে তাদের কাজ করে যাচ্ছিল। সব ক'টা খনিতেই তারা সর্বশক্তি নিয়ে নেমে পড়েছিল, তা' সে ভিদ্‌কোভিচ্‌ বা ত্রিনেক্‌ যেখানেই হোক না কেন। এমন কি ফ্রাইদেক্‌-এর কাপড় কলেও তারা লাগাতার লড়ে যাচ্ছিল। খনিমজুর, ধাতুশ্রমিক ও বয়নশিল্পে নিযুক্ত নারী শ্রমিকদের তারা এটাই বোঝাতে চাইছিল যে ধর্মঘটীদের সাহায্য করলে তা' বৃথাই যাবে, কোন লাভই হবে না। তারা এটাই বোঝাচ্ছিল যে চার্লস্‌ ফাউণ্ড্রীর শ্রমিকদের আন্দোলন শিগ্‌গীরই মার খাবে, কারণ হাজার হাজার বেকার নাকি ডিরেক্টরের কাছ থেকে ডাক পাবার অপেক্ষায় বসে রয়েছে। এছাড়া নাদেক্‌-এ যেসব বেকার রয়েছে, কোম্পানি নাকি ইতিমধ্যেই তাদের যোগাড় করে ফেলেছে, এমন কি সেখানে তাদের আনতেও শুরু করেছে এবং চার্লস্‌ ফাউণ্ড্রীর

পাশে তাদের নতুন বস্তী গড়ে উঠল বলে। তারা এসে গেলেই নাকি ধর্মঘট ভেঙ্গে যাবে। এসবই তারা বলতে থাকল। এর ওপর বাড়তি তারা যা' করল তা' হোল, নাদেক্-এ তারা নতুন করে লোকজন পাঠালো, আর নিজেদের তৎপরতা দেখিয়ে তারা ওখানকার লোকজনদের এটাই বোঝাতে চাইল তারাই বিজয়ী হয়েছে। আর এসবের অর্থ দাঁড়াল যে বেকাররা শেষ পর্যন্ত কাজ পেতে চলেছে ; সুতরাং খিদের জ্বালায় তারা যদি মরতে না চায় তবে এ সুযোগ হাতছাড়া করা তাদের একেবারেই চলবে না। এভাবেই তারা কাজ করে যাচ্ছিল আর এভাবেই তারা একটা আবহাওয়া তৈরী করে ফেলেছিল। ডিরেক্টর ফেদের'রের ভাড়া করা বুদ্ধু ধর্মঘট-ভাঙ্গিয়েদের তৈরী পরাজয়ের আবহাওয়ার মত ঠিক এটা ছিল না, এটা ছিল শ্রমিকশ্রেণীর নির্বীর্যতার আবহাওয়া।

আর সেজন্যেই, যখন কমরেডটির স্ত্রী জিগ্যেস্ করল, "আর কতদিন চলবে ?", তখন তার প্রশ্নের মধ্যেই ফুটে উঠেছিল অনিশ্চয়তা, আস্থাহীনতা, নির্বীর্যতাব এক স্পষ্ট অনুভূতি।

কমরেডটি বলল, "সত্যিই তো, তুমি আর কি জান ? আর তোমাকে আমরা কি-ই বা জানাতে পারি ? আমরা যা' করতে পারি বলতে গেলে আসলে তা' তেমন কিছু নয়। আসলে আমাদের নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসের এমন কোন বাঁধন নেই, যাতে আমরা কিছু একটা করতে পারি। আমি লড়াই করব, আর ঠিক আমার পাশের লোকটি লড়বে না, সে হয়ত আমার স্থানটাই নিয়ে নেবে আর নিজের বলতে আমার যেটুকু রয়েছে, সেটুকুও আমি খোয়াব। আবাব এমনও হতে পারে, আমার পাশের লোকটা হয়ত আমার জায়গাটা কিছুতেই দখল করে নিতে চাইবে না, হয়ত সেও লড়াই করবে, তবে তার মনে এই ভয় থেকেই যেতে পারে যে আমি আবার লড়াই ছেড়ে তাকে ফেলে পালাবো না তো, তার কাজটা আমিই নিয়ে নেব না তো, সে তার কাজটা হারাবে না তো। আর, যদি আমরা নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করেও নি, তা' সত্ত্বেও সেই ভয়টা তো থেকেই যাবে যে, যে লোকটা গত ছ' মাস কাজ খুইয়ে বেকার বসে আছে, সে তো খনির মুখেই ওৎ পেতে আছে, আবার এমনও হতে পারে সেই লোকটা হয়ত লড়াই করতে আমাদের চেয়েও বেশী প্রস্তুত। সত্যি বলতে কি আমরা নিশ্চিতভাবে কিছুই জানি না। আর আমরা পরস্পরের প্রতি এমনই আচরণ করছি যেন আমরা পরস্পরকে আর সেভাবে বিশ্বাসও করতে পারছি না। ডিরেক্টর—ওটা অন্য ব্যাপার। সে নিজের লোকজনদের নিয়ে নিজের রাস্তাতে দিব্যি চলেছে, তাছাড়া সে আমাদের ভয় করে না এতটুকুও, কারণটা আর কিছুই নয়—আমরা জোট বাঁধতে পারিনি। সে

চার্জশীট দিচ্ছে, মজুর ছাঁটাই করছে, মজুরি কাট্‌ছে আর তাকে আমরা কোনভাবেই ঠেকাতে পারছি না, কারণ, আমাদের নিজেদের মধ্যে কোন ঐক্য নেই, নেই কোন সংহতি। কে জানে, আমরা কখনও তা' পারবো কিনা অথবা তারা আমাদের দিয়ে যা করিয়ে নিতে চায়, তারা তা' করাতে পারবে কিনা ... ।"

ফ্রাইদেক্‌-এর দিকে তাকিয়ে রইল সে। ইতিমধ্যে গোধূলির গোলাপী আলো রাস্তার ধূলোতে এসে পড়েছে ; আর সেই ম্লান আলোকে আমাদের কমরেডটিকে অনেক বেশী বৃদ্ধ মনে হচ্ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার কোটরাগত চোখ দু'টোর তলায় বছরের পর বছর ধরে কত না কয়লার ধূলো জমেছে।

কমরেডটি বলেই চলল, "কিন্তু, আমাদের যৌবনের দিনগুলোর মত যদি আমরা অন্যভাবে শুরু করতাম! তুমি জান, তখন আমরা ছিলাম নৈরাজ্যবাদী আর তারা তখন আমাদের ভয় করত। আচ্ছা তুমি কি মনে কর না, যদি ঐ ধরণের একজন ডিরেক্টর আমাদের অতীত সম্পর্কে সেরকম কিছু স্মরণ করতে পারে, তাহলে সেও নিশ্চয়ই চুপ মেরে যাবে? আর তুমি কি এও মনে কর না, যদি ঐ ধরণের একজন সেক্রেটারী আমাদের ঐসব পুরোনো কাহিনীর দু' একটাও অন্ততঃ স্মরণ করতে পারে, তাহলে সেও নিশ্চয়ই আমাদের সংগে অন্যরকম ব্যবহার করবে? তুমি কি মনে কর, ওসব কোন কাজের ব্যাপারই নয়?"

আমি বললাম, "না, কমরেড না। ওসব কোন কাজের কথা নয়—ওসবে কিছুই হবে না। ডিরেক্টর বা সেক্রেটারী এরা কেউই একা নয়। এদের রক্ষা করতে সমস্ত ক্ষমতাই একত্রে জেগে উঠবে। আর তুমি যেমন ভাবছ যেন একজন লড়ছে শুধুমাত্র অন্য আরেক জনের বিরুদ্ধে, ব্যাপারটা তখন হয়ে দাঁড়াবে অন্যরকম, অর্থাৎ একজনের লড়াই হাজার জনের বিরুদ্ধে। আর তুমি কি মনে কর ওসব ব্যাপার তোমাকে তখন কোনভাবে সাহায্য করবে? ...আসলে গোটা ব্যাপারটাই অন্যরকম। আর তাই, একটা মাত্র লোকের ওপর আঘাত হেনে তুমি কখনই গোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পারবে না। আর এ হোল সেই নিষ্ঠুর ব্যবস্থা যা' কাজের সময় তোমার রক্ত শুষে নিঙ্‌ড়ে নেয়, তোমার কাজের ফসলকে লুণ্ঠন করে ; যার জন্যে তোমাকে ক্ষুধায় কষ্ট পেতে হয়, সমস্ত যন্ত্রণার শিকার হতে হয়। তুমি কিছুতেই এর সংগে পেরে উঠবে না। তোমাকে সেই রাস্তাই বেছে নিতে হবে যা' হয়ত খুবই দীর্ঘ মনে হতে পারে তোমার কাছে—কিন্তু সেটাই একমাত্র পথ যা' তোমাকে প্রকৃত জয়ের পথে নিয়ে যেতে পারে। হাজার হাজার শয়তান ক্ষমতা দখল করে রেখেছে, তাদের কাছ থেকে সেটা ছিনিয়ে নিতে তাই দরকার লক্ষ লক্ষ লোকের ..."

"কমরেড, আমি তা' জানি। কিন্তু যখন সহ্য করার ক্ষমতা বলতে তোমার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তখন? যখন বারে বারে চেষ্টা করেও তুমি কোন অবলম্বন খুঁজে পাও না, তখন? যখন প্রত্যেকটা শয়তান মনে করে তোমার কাছ থেকে তাদের ভয় পাবার কিছুই নেই আর তাই সাহস পায় তোমার কাছ থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নিতে, তখন?

"তখন, তুমি নিজেকে কোনওভাবে সাহায্য করার কথা ভাবতে পার না, কিন্তু অন্ততপক্ষে প্রতিশোধ তো নিতে পার, কারণ তখন সেই শয়তানের মুখোমুখি হওয়া ছাড়া আর কোন পথই যে আর তোমার সামনে খোলা থাকে না…"

ফ্রাইদেক্ যাবার পথের ধারে সেই খনিমজুরটির কুটীরের দরজার সিঁড়িতে অনেকক্ষণ বসে রইলাম আমরা। রাত্রি নেমে এলো। ভিদ্‌কোভিচ্-এর ব্লাস্ট ফার্নেসের আগুনের প্রজ্বলিত শিখার আলো সীমানায় দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। হয়ত তাকে আমি 'ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম, হয়ত পারলাম না! যদিও তার বোঝার পক্ষে এটা কোন কঠিন ব্যাপারই নয়, কারণ আর যাই হোক, সে নিজেই তো সেভাবেই কাজ করে চলেছে। এসত্ত্বেও লিস্‌কোভেক্-এর পথে শোনা তার সেই কথাগুলো আমার কানে বাজতে থাকল: "আমার ক্ষুধার জ্বালা যদিও এত বেশী হয় যে অন্যেরা বোঝার আগেই আমি যদি তা'কে ধরে রাখতে না পারি?"

তখন খনিমজুর কারেল ক্লিম্‌শা 'প্রোগ্রেস' খনিতে কাজ করছিল।

আর ঠিক সেই সময়ে কর্তৃপক্ষের কাছে যদি তুমি তার চরিত্রের কথা জিগ্যেস করতে, তাহলে তারা ক্লিম্‌শা সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল কথাগুলোই তোমাকে শোনাত। তারা হয়ত বলত যে সে একজন সৎ, পরিশ্রমী ও বিবেকমান শ্রমিক, তার সম্পর্কে খারাপ কিছুই বলার নেই—শুধুমাত্র এইটুকুই বলার আছে যে পার্টির একজন লোক না হয়েও সে রেড্ ট্রেড-ইউনিয়নের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে দাঁড়াতে মত দিয়েছিল। আর যারা তাকে জানত তারা হয়ত এর সঙ্গে আরও কিছু যোগ করে দিত। তারা হয়ত বলত, সে ঐ নির্বাচনের ব্যাপারে মত দিয়েছিল, কারণ ক্লিম্‌শা ছিল সৎ, বিবেকবান, দায়িত্ববোধসম্পন্ন একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি; তাছাড়া সে ছিল এমন একজন যে তার স্ত্রীকে ভালবাসত, সিগারেট খেত না, মদ্ ছুঁতো না; শুধুমাত্র একটা অদ্ভুত নেশার পেছনেই সে টাকা কড়ি খরচ করত, আর তা' হোল বাড়ীর এক কোণে বসে রহস্যময় কিসব যন্ত্রপাতি নিয়ে সে নাড়াচাড়া করত।

এক সৃজনশীল নেশার মত সেটা তাকে পেয়ে বসেছিল।

ক্লিম্‌শা যা' কিছু করতে পারত, খনির নিদারুণ সীমাবদ্ধতা সেসব কিছু করার আকাংক্ষা থেকে তাকে বিচ্যুত করতে পারত না। ক্লিম্‌শার নিজস্ব

কিছু ধ্যানধারণা ছিল এবং সে নিজেই জানত কেমন করে সেগুলোকে কার্যকরী করতে হয়। যে সব ভদ্রলোকেরা পুঁজিবাদী সমাজের শাসন দণ্ড ধরে থাকে তারা একথা বলে মজা পেয়ে থাকে যে কমিউনিস্টরা নাকি মস্তিষ্কের কাজকে ক্রমাগতভাবে কমিয়ে আনতে চাইছে। তারা আরও বলে থাকে যে মানসিক সৃজনশীলতার সঙ্গে পেরে উঠতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ কি নিদারুণভাবেই না অক্ষম! সমাজতান্ত্রিক সমাজ কিভাবে মানসিক সৃজনশীলতার ব্যাপারটাকে দমন করে থাকে এই নিয়েও তারা নানা কথা বলে থাকে। কিন্তু ক্লিম্‌শা, নিজেই এমন একটা দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে, যা' প্রমাণ করে এর বিপরীতটা, অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজ কিভাবে বিপুল পরিমাণ মানসিক ক্ষমতাকে অবদমিত করে রাখে। ক্লিম্‌শার জীবনই প্রমাণ করে যে, পুঁজিবাদী সমাজ আজ পর্যন্ত যা' সৃষ্টি করতে দিয়েছে, তার চেয়েও হাজার গুণ বেশী সৃষ্টি করার হিম্মত্‌ রাখে যে শ্রমিকশ্রেণী, তাকে পুঁজিবাদী সমাজ কিভাবে অবদমিত করে রাখে। ক্লিম্‌শার কারিগরি প্রতিভাকে আজকে প্রকাশ্যে স্বীকার করা হচ্ছে, কিন্তু বেঁচে থাকতে ক্লিম্‌শা কোনদিনই সেই সক্ষমতাকে বিকশিত করতে পারেনি। বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ তার ছিল না, সম্ভবতঃ উচ্চতর বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের স্বপ্নও সে কখনই দেখেনি ; কারণ, সে জন্মেছিল এক সাধারণ খনিমজুরের ঘরে। আর সাধারণত খনিমজুরদের ভাগ্যে যা ঘটে থাকে, তার বাবার মৃত্যুও ঘটেছিল সেভাবেই অন্ধকার খনিগর্ভে। একজন খনিমজুরের অনাথ সন্তানের অভিশপ্ত জীবনকে সম্বল করে অজস্র দুঃখ-কষ্টের বাধা ডিঙিয়ে চলতে হয়েছিল তাকে। শ্বাসরোধকারী খনিগর্ভে সমস্ত শক্তি নিঙ্‌ড়ে নেবার দুঃসহ অবস্থা সত্ত্বেও, তার প্রতিভাকে সার্থকভাবে কাজে লাগাবার কোন সম্ভাবনাকেই সে ম্লান হতে দেয়নি। এবং এভাবেই সে চালিয়ে গেছে। খুবই মান্ধাতার আমলের কারিগরি জ্ঞান, সেইরকমেরই সব যন্ত্রপাতি আর সে যা' কিছু যোগাড় করতে পারত, তাই দিয়েই বুর্জোয়া বিজ্ঞানের ভাঁড়ার থেকে সে এমন কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছিল, যা' উল্লেখের দাবী রাখে, এমনকি পুঁজিবাদের কারিগরির ক্ষেত্রেও।

একজন খনিমজুরের কাজ কারবারের এক্তিয়ারের বাইরে অবশ্য সে কিছুই জানত না। আর এই ব্যাপারটার সংগে যুক্ত নয়, এমন কোন কিছু উদ্ভাবনেই সে মাথা ঘামাত না। কাজ করার ব্যাপারটাকে আরও উন্নত করা, খাটুনির ব্যাপারটাকে আরও একটু কমানো এর বেশী সে আর কিছুই ভাবত না। খনিতে ব্যবহারের ড্রিল-হ্যামারকে অনেক নিখুঁত করেছিল সে এবং এমন এক স্লেজ্‌ ব্যবস্থা সে উদ্ভাবন করেছিল, যাতে করে আপনা থেকেই ড্রিল-হ্যামার এগিয়ে যেতে পারত। এভাবেই সে শ্রমিকের হাতের শ্রমকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। তার ঐ উদ্ভাবনকে

পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল এবং তা' সাফল্যের সংগেই উত্‌রেছিল। ভিদ্‌কোভিচ্‌ ষ্টীল ওয়ার্কস্‌ উদ্ভাবক হিসেবে এজন্য তাকে দু'হাজার চেক ক্রাউন দিয়েছিল (যদিও অনতিবিলম্বেই পেটেণ্ট-ফী হিসেবে সেটা তার কাছ থেকে তারা ফিরিয়েও নিয়েছিল।) উৎসাহে সে নতুন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আর সফলও হয়েছিল সে। সেই মুহূর্তটার প্রতীক্ষায় বসেছিল সে, যেদিন তার স্বীকৃত উদ্ভাবনটাকে সর্বপ্রথম খনিগর্ভে কাজে লাগানো হবে। কিন্তু তা' আর কখনই হোল না।

আজকের বুর্জোয়া কাগজগুলো ক্লিম্‌শার সেই উদ্ভাবনটার প্রসঙ্গে ঠিক উল্টো বক্তব্যই রেখে থাকে। তারা বলে, আসলে একজন খনিমজুর নাকি এমন কিছু একটা উদ্ভাবন করেছিল, যাতে করে খনিতে লোকজনের প্রয়োজন আরও কমানো যায় এবং এসব বলেই তারা আরও বহু লোকের কাজ কেড়ে নিতে চেয়েছিল। আর নিজেও কি দারুণ ধাপ্পার শিকারই না হয়েছিল ক্লিম্‌শা! অর্থনৈতিক মন্দার জন্যে নাকি নতুন বিনিয়োগ সম্ভব হচ্ছিল না, আর সেজন্যই নাকি তারা ক্লিম্‌শার ঐ উদ্ভাবনটাকে খনিতে কাজে লাগাতে পারছিল না। কারিগরি সাফল্য সম্পর্কে আসলে ক্লিম্‌শার অন্যরকম মনোভাবই থাকা উচিত ছিল, কারণ শেষ পর্যন্ত নিজেকেই তো র‍্যাশনালাইজেশনের শিকার হতে হোল আর উৎখাত্‌ হতে হোল খনি থেকে। আর বলতে গেলে, মানুষের ভাগ্যের বিস্ময়কর পরিহাসের শিকার হতে হোল তাকে …।

সব মানুষের ভাগ্যেরই কি এই পরিণতি? খনিমজুর-উদ্ভাবক বলেই হয়ত ক্লিম্‌শার জীবনে এরকম উল্টো একটা ব্যাপার ঘটে গেল! আসলে কিন্তু সব কিছু ওলট-পালট করে দেবার শয়তানটা হোল এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা। পুঁজিবাদী দুনিয়া এমন কোন উদ্ভাবনকেই গ্রহণ করতে পারে না যা' শ্রমিকদের জীবনকে আর একটু সহজ ও স্বচ্ছন্দ করে তুলতে পারে। আর অবশ্যই একে ক্ষমার অযোগ্য একটা অপরাধ ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত সাফল্যগুলো পুঁজিপতিদের মুনাফা বাড়ানোর কাজে লাগবে, ততদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র সেই সমস্ত উদ্ভাবনগুলোই টিঁকে থাকার ছাড়পত্র পাবে যেগুলো শ্রমিকদের মৃত্যুকে কাছে ডেকে আনতে পারবে। ব্যাপারটা একই রকম থেকে যাবে, তা' সেই উদ্ভাবনকে বিষাক্ত গ্যাস তৈরীর কাজে অথবা বোতাম বসাবার যান্ত্রিক ব্যবস্থাতে, যেখানেই লাগানো হোক না কেন।

ক্লিম্‌শা যখন ড্রিল-হ্যামারের কার্যকারিতা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিল, ঠিক সেই একই সময়ে 'জিগান্ত' রাষ্ট্রীয় খামারের মেশিন-শপ্‌-এর কলকব্জা-মিস্ত্রী কমরেড মার্তিনভ্‌ অন্য একটা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলো। আর সেই

সমস্যাটাও ছিল তার নিজের কাজকর্মের এক্তিয়ারেই। কমরেড মার্তিনভ্-এরও কোন বিশেষজ্ঞের প্রশিক্ষণ ছিল না তাছাড়া প্রতিভার সেরকম কিছুও কেউ তার মধ্যে আবিষ্কার করেনি। কিন্তু তাবলে তার সমস্যাটা কোন দিক দিয়েই কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না! 'জিগান্ত' খামারের প্রবেশ পথের সামনেই ছিল শস্যপূর্ণ মাঠ এবং শেড্-এ মার্কিনী কারিগরির সুন্দর এক নমুনা স্বরূপ একটা কম্বাইন এই আশায় ব্যাগ্রভাবে অপেক্ষা করছিল যে কখন শস্যের শীষগুলো থেকে শীর্ষগুলোকে ছেঁটে ফেলতে হবে। ব্যাস্, ঐ পর্যন্তই! কম্বাইনটা পারতো শীষগুলোকে ছেঁটে ফেলতে, পারত শস্যের দানাগুলোকে আলাদা করতে, ঝাড়াই করতে পারত, একত্রিত করতে পারত, পারত লরীতে ঢেলে দিতে। তবে কম্বাইনটা মোটেই জোরে চলতে পারত না আর কোনভাবে শীষগুলোকে বাঁচাতেও পারত না। শীষগুলোকে পিষে ছিবড়ে করে ফেলত আর অব্যবহার্য্য আবর্জনা হিসেবে মাঠের সর্বত্র ছড়িয়ে রাখত। আমেরিকার বড বড় খামার-মালিকদের কাছে শীষের কোন প্রয়োজনই ছিল না, আর তাই মার্কিন কারিগরিতে ওসব নিয়ে চিন্তা ভাবনার দরকারটাই বা কি? কিন্তু 'জিগান্ত'-এর শীষের দরকার, আর তা' দরকার রাষ্ট্রীয় পশুপালন খামারের জন্যে। আর সেজন্যই, মার্কিনী খামারের দিক দিয়ে ভাবলে তো তাদের চলতো না, তাদের ভাবতে হচ্ছিল কিভাবে যথেষ্ট পরিমাণ শীষকে বাঁচানো যায়, কিভাবে সম্পদের সর্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার করা যায়, যেহেতু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কাজকর্মের নীতিটাই ঐরকম।

'জিগান্ত' মেশিন-শপ্-এর কলকব্জা-মিস্ত্রী কমরেড মার্তিনভ্ মাথা খাটিয়ে কয়েকটা জিনিষ উদ্ভাবন করে ফেলল। আর পরের বার যখন নতুন শস্য ফললো, তখন মার্তিনভের তৈরী মেশিনগুলোকে দেখা গেল কম্বাইনগুলোর পেছনে পেছনে শস্য-ভরা মাঠের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে আর মেশিনের লোভী মুখগুলো দিয়ে শীষগুলোকে গিলে ফেলছে এবং পিষে ফেলছে। আর এভাবেই শতকরা পঞ্চাশ ভাগ শীষকে বাঁচানো গিয়েছিল। কমরেড মার্তিনভ্ নিজের যোগ্যতা দেখিয়েছিল। তাকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল লেখাপড়া শেখবার জন্যে, যাতে করে তার প্রতিভাকে আরও বেশী সুরক্ষিত ও বিকশিত করা যায় এবং সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো যায়।

এই যে দু'জন উদ্ভাবক, ক্লিম্‌শা আর মার্তিনভ্, হয়ত যৌবনে তাদের দু'জনের মধ্যে অনেক মিলই ছিল; হয়ত তাদের পথ ও জগৎ ছিল একই। কিন্তু দু' বিশ্বের সংযোগস্থলে তাদের ভবিতব্য পৃথক হয়ে গিয়েছিল।

সেই কলকব্জা-মিস্ত্রী মার্তিনভ্ আজ একজন শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার আর খনিমজুর ক্লিম্শা একজন খুনে।

এই পার্থক্যের জন্যে কোনভাবেই কি ক্লিম্শাকে দায়ী করা যায়?

কারেল ক্লিম্শা তার দ্বিতীয় উদ্ভাবনটাকে আর সম্পূর্ণ করতে পারল না। দারিদ্র্য ও পেটেন্ট-ফীর ঝামেলা যেন তার কাজের চারপাশে ভীড় করে এলো। নতুন কোন আবিষ্কার যদি করতে চাও জানো তোমাকে কত ফী দিতে হবে? যদিও কারেল ক্লিম্শা সঠিকভাবে জানত না, তবুও টাকার অঙ্কের কথা ভাবলেই সে আঁত্কে উঠত কারণ ঐ ড্রিল-হ্যামারের ব্যাপারে একটা বেশ বড় অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বেই তার হয়ে গিয়েছিল। তবে তাকে আর বেশীদিন ভয়ে ভয়ে ওসব নিয়ে কাটাতে হোল না, কারণ নিদারুণ দারিদ্র্যই শেষ কথাটা বলে দিল।

১৯৩৫ সালের ৫ই জানুয়ারী। ওস্ত্রোভা অঞ্চলের অনেক শ্রমিককেই ছাঁটাই করা হোল। খনিমজুর ক্লিম্শাও ছিল তাদেরই একজন। খনিগুলোতে মালিকেরা এক একজন শ্রমিকের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল একখানা করে চিরকুট, যাতে ছিল তথ্য ও স্ট্যাম্প সম্বলিত শ্রমিকটির নিয়োগপত্র, তার শ্রমিক-জীবনের ইতিহাস ইত্যাদি। আর তারা যখন ঐ চিরকুটগুলো ভরে ফেলল, তখন মনে হোল জীবন বোধহয় তাদের গলার টুঁটি চেপে ধরেছে, তারা হয়ত আর কখনও শ্বাস নিতে পারবে না।

অন্যান্যদের মত ক্লিম্শাও আঘাতটাকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তার ঐ চাক্‌রি যাওয়াটা অর্থাৎ না খেয়ে নীরব থাকার দণ্ডটা তার ওপর এক দুঃসহ বোঝার মত চেপে রইল; চেপে রইল মৃত্যু পর্যন্ত। ওটা তার কাছে একটা ভয়াবহ অবিচার বলেই মনে হয়েছিল, আর কিছুতেই তা' সে ভুলতে পারছিল না। প্রথম প্রথম দিন কয়েক সে খনির আশে পাশেই ঘুরে বেড়াল, হয়ত কর্মহীন আলস্যের জীবনের সংগে সে ঠিক অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারছিল না। তারপরেই হঠাৎ সে নিজেকে একেবারেই গুটিয়ে নিল এবং ঘরের এক কোণে বসে রইল আর নতুন কোন এক গবেষণার পেছনে নিজেকে একেবারে ঢেলে দিল। তার নিজের মধ্যে সবকিছু হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত তার মধ্যে ছিল কত না প্রেরণার উৎস! একের পর এক কত রকম চিন্তাভাবনা তার মাথায় খেলে যেতে থাকল, বলতে গেলে সে তখনও যেন জীবনের সঙ্গে দর কষাকষি করেই চলেছিল। তখনও সে বিশ্বাস করত, ওই দুর্বিসহ অবস্থা থেকে সে নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসতে পারবে এবং সে মনে করত যে একাকীই ওই অবস্থা থেকে নিজেকে সে বার করে আনতে পারবে।

ক্রমেই সে বুঝলো তার সামনে আর কোন পথই খোলা নেই। হয়ত সে দেখেছিল ওই দুঃখ কষ্টের সে একাই শিকার হয়নি; হয়ত সে দেখেছিল বিরাট সংখ্যক খনিমজুরের একটা বাহিনী তারই মত অসহনীয় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। আর সে যে তা' দেখেছিল, তার চিঠিই সেই কথা বলছে। তবে সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে সে ঐ হাজার হাজার মানুষকে একটা বিরাট বাহিনীর আকারে দেখেনি। সে প্রতিটি ব্যক্তিকে আলাদা আলাদা করে দেখেছিল, দেখেছিল তারা প্রত্যেকেই উপবাসী, ক্লান্তি-জর্জর আর তার নিজের মধ্যে দেখা দিয়েছিল সীমাহীন হতাশা। অথচ তারা প্রত্যেকেই নিজের ভাগ্যকে টেনে নিয়ে চলেছিল, কেউই এটা অনুভব করতে পারছিল না এই দুঃসহ অবস্থাটাকে ঘোচানো যেতে পারে একমাত্র সবাইয়ের মিলিত প্রচেষ্টাতেই, কারণ বাস্তবে ব্যাপারটা কারুর একার ছিল না, ছিল সবায়ের মধ্যেই সাধারণভাবে। আর অজস্র মানুষেব দুঃখকষ্টের মধ্যে ছিল যে অনন্ত শক্তির উৎস, তা' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্লিম্‌শা নিজেব দুঃখকষ্টের অবসান ঘটাতে চেয়েছিল। সেই ক্লিম্‌শা! সেই উদ্ভাবক ক্লিম্‌শা! সেই কর্মযোগী ক্লিম্‌শা! সেই ক্লিম্‌শা হয়ে গেল বেকার, হোল ক্ষুধার্ত। সেই উদ্ভাবক-ক্লিম্‌শা বেকারীত্বে নিঃশেষ হয়ে গেল।

আমি জানি, ঠিক কখন ওসব ঘটেছিল। কিন্তু যারা বলে বেড়ায়, "আমরা কখনই জানতে পারব না ক্লিম্‌শার মনের গহনে কি ঘটেছিল", তখন মনে হয় যে, হয় তারা মিথ্যে বলছে নয় তারা নিজেদের জীবনকে এতখানি পঙ্গু করে ফেলেছে যে ওসব কিছু ভাববার ক্ষমতাও তারা হারিয়ে ফেলেছে। "আমরা কখনই জানব না"—দেখ, মনস্তাত্ত্বিক বাকচাতুরির আডালে কি দারুণ আবেগমাখা ভণিতা! আহা, সেটা না জানি কি দারুণ বিচক্ষণতার কাজ, তাই না! কিন্তু আসলে আমরা সবাই জানি যে ক্লিম্‌শা তার দলিলটা রেখে না গেলেও আমরা সবাই তা' জানতে পারতাম।

সে যাই হোক, ক্লিম্‌শা তো একটা চিঠি রেখেই গেছে—দারুণ একটা চিঠি। আর সেটাই বলে দিয়েছে, যা' "তার মনের গহনে ঘটেছিল।"

"আমার জন্মের আগেই বাবা খনিগর্ভে মারা গিয়েছিলেন। ছেলেমেয়েদেব খাওয়াতে তাই মাকে কাজ করতে হোত। মা যখন কাজে বেরিয়ে যেতেন, তখন আমাকে ও বোনকে খামার-মালিকের বয়স্ক সব ছেলেমেয়েদের কাছে মা রেখে যেতেন আর আমরা নিজেদের নিয়ে মেতে থাকতাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে খামার মালিকের ছেলেমেয়েরা ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছিল যে আমরা পিতৃহারা শিশু; আর তাই আমাদের নিয়ে তারা যা' খুশী তাই করতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত

মা কাজে বাইরে থাকতেন, ততক্ষণ তারা আমাকে ও বোনকে হাঁটু-ভেঙে আধ-বসা করে দাঁড় করিয়ে রাখত আর মজা পাবার জন্যে আমাদের কষ্ট দিত। ওভাবেই আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হোত, আর একটু নড়াচড়া করলেই সবচেয়ে বড় ছেলেটা তার স্ট্র্যাপ্ দিয়ে আমাদের চাবকাতো। আর যদি আমরা অনেকক্ষণ নড়াচড়া না করতাম, তাহলে আমাদের গায়ে তারা জল ঢেলে দিত, মরা মাছি ও যত রকমের সব আবর্জনা মুখের মধ্যে পুরে দিত, যাতে করে আমরা ছটফট করতে বাধ্য হই এবং আমাদের মারধোর করার আর একটা সুযোগ তাদের আমরা করে দিই।

"পরে যখন মা জনৈক বিপত্নীক এম্.-এর সংগে ঘর বাঁধলেন, এবং সামপের্ক এর এস্টেটে একই বাড়ীতে থাকতে শুরু করলেন, সেই সময়ে সেই এস্টেটের মালিক শ্রীমতী ভি. একদিন মার কাছে এসে অভিযোগ করলেন যে আমি নাকি তার মেয়ের গার্টার ছিঁড়ে দিয়েছি। কথাটা ছিল নির্ভেজাল মিথ্যে। কিন্তু, এ সত্ত্বেও আমাকে মার খেতে হোল আর শ্রীমতী ভি. তাঁর ছেলেমেয়েদের সংগে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা' দেখলেন। শ্রীমতী ভি. ও তাঁর ছেলেমেয়েরা পাছায় হাত রেখে আর কনুইগুলো বাইরের দিকে বড়িয়ে দিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল যে আমি লুকোবার কোন জায়গাই পাচ্ছিলাম না আর তারা খুশীতে ডগমগ হয়ে আমার সেই মার খাওয়া উপভোগ করছিল। যখন আমার নাক বেয়ে রক্তের ধারা নেমে এলো এবং তা' সত্ত্বেও মা আমাকে মেরেই চলেছিলেন, তখন শ্রীমতী দয়াপরায়ণ হয়ে বললেন যে যথেষ্ট হয়েছে এবং বিদায় নিলেন। আর যেই তিনি চলে গেলেন, অমনি সেই ছেলেমেয়েরা বলে উঠল, "মা, গার্টারটা ছিঁড়ে দিয়েছে কারেল পাসা।" যদিও তারা নিজেরাই গার্টারটাকে ছিঁড়েছিল তবুও তারা চাইছিল অধস্তন ব্যক্তির বাচ্চা শিশুকে মার খাইয়ে সেই দৃশ্যটা উপভোগ করতে। তারা ছিল ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে, তাই তাদের কথাকে তো আর অবিশ্বাস করা চলে না আর তাই আমার প্রতিবাদের কোন মানেই ছিল না। অযথা আমাকে মার খেতে হোল, শুধুমাত্র এই কারণেই যে শ্রীমতী ভি. নিজের চোখে দেখতে চান যে অধস্তন মানুষেরা তার ইচ্ছার কাছে মাথা নোয়াচ্ছে।

"একই ধরণের দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটেছিল গত বছরে। শ্রীযুক্ত এফ.-এর হয়ে প্রমাণ দিতে সালিসীর জন্যে খনিমজুরদের যে আদালত রয়েছে সেখানে আমাকে হাজিরা দিতে হয়েছিল। বাদী পক্ষের সাক্ষা পিটারভালড্-এর কে. আমাকে বলেছিল যে আমি যেন শ্রীযুক্ত এফ.-এর বিরুদ্ধে প্রমাণ দাখিল করি। কিন্তু সালিসী আদালতে তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কে. এটাই অস্বীকার করেছিল এবং বাদানুবাদের ফাঁকে আমাকে বলেছিল যে এভাবে মিথ্যে বলার জন্যে আমার লজ্জিত হওয়া

উচিত। (আমি অবশ্য লক্ষ্য করেছিলাম যে তদন্তকার্য এমনভাবে করা হয়েছিল যা'তে কারখানার পরিচালকদের গায়ে আঁচড় না লাগে। আর আদালত কর্তৃপক্ষ তাকেই বিশ্বাস করেছিল কারণ সে প্রভুদের স্বার্থকেই সমর্থন করেছিল এবং আমি সেখানে একজন মিথ্যুক বনে গিয়েছিলাম।)

আমি যখন ছোট ছিলাম, তারা মিথ্যে বলেছিল যাতে করে ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েদের মজার সাধ মেটাতে আমাকে মার খেতে হয়েছিল। আর, এখন আমি বড় হয়েছি আর তারা মিথ্যে বলেছে শ্রীযুক্ত জি. ও শ্রীযুক্ত এইচ.-এর মজার জন্যে। এরা মেরুদণ্ডহীন মানুষ। আমি আর কখনও এতট' নীচে নামব না যাতে করে আমাকে মিথ্যের পক্ষে দাঁড়াতে হয় এবং প্রভুদের তোষামোদের জন্যে সত্যকে ঢাকতে হয়।

"জীবনে আমি কখনও কাকর কেশাগ্র স্পর্শ করলাম না, আর আমাকেই কিনা একাধিকবার উপবাসে শুকিয়ে মরতে হচ্ছিল। কি বিপুল উৎসাহ নিয়েই না আমি বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গন থেকে এই মুক্ত দেশে ফিরে এসেছিলাম! এই বিশ্বাস আমার ছিল যে দেশে আমাদের আর কোন দিনই 'বোরেমিশ্ হুণ্ডে' নামে অপমানিত হতে হবে না; কিন্তু আমাদেরই দুর্ভাগ্য যে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিকদের নাগরিক হিসেবে দেখলো না, দেখলো একপাল ষাঁড, গাধা, বুনো, গেঁয়ো, কুঁড়ে, অপদার্থ গরুর পাল হিসেবে। শ্রমিকদের মুখে তারা থুথু ফেলতে চাইত। আমার গোটা জীবনটাই হোল এক অশ্রুধোয়া উপত্যকা, সেজন্য আমার দুঃখকষ্টকে আমি আর দীর্ঘতর করতে চাই না, কারণ আমি বুঝেছি একজন শ্রমিকের কাছে জীবন হোল এক দুঃসহ বোঝা। জীবনের শ্রেষ্ঠতম আনন্দের আস্বাদ তখনই আমি পেয়েছিলাম যখন আমি প্রথম কয়েকটা ক্রাউন রোজগার করতে পেরেছিলাম আর কিছু সঞ্চয় করতে পেরেছিলাম। তখন আমার একটা এমপ্লয়মেন্ট কার্ড জুটেছিল আব সেই সঙ্গে 'জেরিনা' খনিতে একটা কাজও জুটেছিল। আর সবচেয়ে বড় দুঃখ ও প্রতারণার অভিজ্ঞতা আমার হোল যখন ১৯২৫ এর ১৫ই জানুয়ারী তারিখে আমার চাকরি গেল আর সেই কার্ডখানা আমার গায়েই ছুঁড়ে মারা হোল।"

এই হোল সেই চিঠি যা ক্লিম্‌শা সেদিন সকালে লিখেছিল, যেদিন সে এক দৌড়ে খনির অফিসঘরে ঢুকে পড়েছিল আর সার্ভে-ইঞ্জিনিয়ার গ্রাইগারকে গুলি করেছিল। গ্রাইগারকে সে তাদেরই একজন মনে করত, তাকে চাকরি থেকে উৎখাত্ করার জন্যে যারা দায়ী ছিল। ক্লিম্‌শার মনের গভীরে ঘটে গিয়েছিল দুঃখ, অপমান, অবিচারে ভরা একজন মজুরের স্মৃতি রোমন্থন এবং হয়ত এটাই তার মনে হয়েছিল সে বোধহয় নির্বীর্য হয়ে পড়ছে। ঘটনাটা হচ্ছে এসবেরই ক্রমপরিণতি।

সে যা দেখেছিল, তা' তার নিজের ব্যক্তিগত কোন ব্যাপার ছিল না ; ওটাই ছিল একজন শ্রমিকের জীবনের সত্যিকারের স্বাভাবিক ব্যাপার। ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা যখন আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করত, তখন আমাদের সবাইকেই মার খেতে হোত। যখন মিথ্যের পাহাড় আমাদের সমস্ত ন্যায়বোধকে নিকেশ করে দিত, তখন অন্যায়ের অনুভূতি আমাদের মরিয়ার মত নাড়া দিত। আমরা সবাই উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম—কখন যুদ্ধ থামবে, কারণ আমরা ভাবতাম যুদ্ধ শেষেই নতুন জীবন শুরু হবে। অবশেষে যুদ্ধ যখন শেষ হল, তখন সর্বপ্রথম স্বাধীন-ভাবে কাজ করতে পেরে আমরা গর্ববোধ করতাম। তখন আমাদের শ্রমিকদের উঁচু মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। আর আজকে আমাদের সবাইয়েরই সেই মোহ ঘুচে গেছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই আজ "চাকরি খোওয়ানোর" মানে বুঝেছি, বুঝেছি বেকারীর মানে।

আর এ দিক দিয়ে দেখলে, ক্লিম্‌শার জীবন ছিল একজন সত্যিকারের শ্রমিকের জীবন।

কিন্তু এ বিষয়ে সে যা' করেছিল তা' একজন সত্যিকারের শ্রমিক করতে পারে না। তার হতাশা তার একান্তই নিজস্ব, তা' একজন সত্যিকারের শ্রমিকের থাকতে পারে না। 'অশ্রুর উপত্যকায়' তার অসহায় আর্তনাদ, তা' একজন সত্যিকারের শ্রমিকের ক্ষেত্রে কখনও শোনা যেতে পারে না। ক্ষুধার এই রকম চূড়ান্ত অবস্থাতেও কখনই শ্রমিকদের ব্যাথাদীর্ণ আর্তনাদ উঠতে পারে না।

ক্লিম্‌শার কাজের ধারাটা ছিল তার একান্তই নিজস্ব। সে এমন একজন শ্রমিক-উদ্ভাবক যে হঠাৎ একদিন সব হিসেব-নিকেশের শেষে বুঝে বসল যে এভাবে তার আর চলতে পারে না এবং সেই মুহূর্তেই সে এক শুষ্ক সরকারী বিজ্ঞপ্তি পেল যে সরকারকে লাইসেন্স-ফী বাবদ একশো উনিশ্‌ ক্রাউন দিতে হবে নইলে তার পেটেন্টের অধিকারকে আর সুরক্ষিত রাখা হবে না। অথচ তার তখন একটা পয়সাও ছিল না যা দিয়ে এমন কি পেটের ক্ষুধাকে সে তাড়াতে পারে। হঠাৎ সব কিছু যেন তার মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়ল। অবস্থাটা অনেকটা সেই রকম, যা আমার খনিমজুর কমরেডটি ফ্রাইদেকের পথে সেদিন আমাকে বলেছিল, "...এবং যখন প্রত্যেকটা শয়তান মনে করে যে তোমার কাছ থেকে তাদের ভয় পাবার কিছুই নেই......তখন তুমি নিজেকে সাহায্য করার কথা ভাবতেও পার না, কিন্তু অন্ততপক্ষে প্রতিশোধ তো নিতে পার, কারণ তখন সেই শয়তানটার মুখোমুখি হওয়া ছাড়া তোমার সামনে আর কোন পথই যে খোলা থাকে না..."

এই সেই ক্লিম্‌শা, বেকার ক্লিম্‌শা, যে বেকার-উদ্ভাবক ক্লিম্‌শার কথা ভাবছে।

একটা নতুন কিছু উদ্ভাবনের পেছনে এক গভীর প্রত্যয় নিয়ে ধীরে কাজ করে চলেছে, যার সাহায্যে সে প্রতিশোধ নিতে পারবে। তার বন্দুকের জন্যে সে একটা নতুন বারুদ-আধার বানিয়েছে যাতে বন্দুকটাকে একটা মেশিনগানে পরিণত করা যায়। তার রিভলভারের কার্তুজে এমন একটা নতুন জিনিষ ভরেছে, যা দিয়ে সে তার নিজের জীবনটাকে শেষ করে দিতে পারে। তার মাথায় এমন একটা পরিকল্পনা রয়েছে, যার অন্ততঃ কিছুটা তাকে কার্যকরী করতেই হবে। তার দুঃখ-কষ্টের জন্যে যারা দায়ী তাদেরই একজনকে সে গুলি করতে চায়। খনিগর্ভে নেমে যায় ক্লিম্‌শা, যে খনিতে সে একদিন কাজ করত। আর সে সম্পূর্ণ সচেতনভাবে জানে এটাই তার সেখানে শেষ যাওয়া। বন্ধ হয়ে যাওয়া খনিটার আশে পাশে সে দিন কয়েক ঘুরে বেড়ায়। সেই ইঞ্জিনিয়ারটার প্রতীক্ষায় সে ওৎ পেতে থাকে যাকে সে পরবর্তী শিকার হিসেবে বেছে নিয়েছিল। খুবই দীর্ঘ তার মৃত্যুকাল! ক্লিম্‌শা তা' আর শেষ করতে পারল না। ক্লিম্‌শার মনে পড়ল সেই সব কমরেডদের কথা, যারা তার সঙ্গে বছরের পর বছর কয়লা কেটেছে, জোলো কফি আর রুটির টুকরো খেয়েছে। মনে পড়ল কত মেহনত্‌ করেই না তাকে জোগাড করতে হোত সেই রুটির টুকরো। যেদিন খনির কর্তৃপক্ষ খনিতে কাজ করা থেকে তাকে বাতিল করে দিয়েছিল সেদিনই তার শেষ রুটি জুটেছিল। আর এখন ক্লিম্‌শা একা—সম্পূর্ণরূপে একা! খনির ভেতরে সে নিজেকে সেরকমই নিঃসঙ্গ ভাবল, যেভাবে খনির বাইরে সে ভেবেছে। কয়েকজন করে পুলিশ খনিগর্ভের প্রবেশপথে পালা করে পাহারা দিয়ে চলেছে খনির ভেতরে পরিত্যক্ত অলিতে গলিতে ঘুরতে থাকল ক্লিম্‌শা; রেললাইনগুলোতে হোঁচট খেলো, যার ওপর দিয়ে কোন কয়লাবাহী ট্রলি আর চলে না। খনিগর্ভে গহন অন্ধকারে ক্লিম্‌শার বাতির আলোয় স্তরে স্তরে সাজানো কয়লার আলোর ঝলকানি বেরোতে থাকল। এই সেই খনিগর্ভ একদিন যা' কর্মচাঞ্চল্যে আলোড়িত ছিল; আর আজ সেখানেই কর্মশূন্য পৃথিবীর এক নিস্তব্ধ চিত্র। আর সেখানেই রয়েছে ক্লিম্‌শা, রয়েছে সম্পূর্ণ একাকী।

আস্তে আস্তে বাতিগুলো নিভে আসে। 'প্রগ্রেস' খনিতে আলো জ্বালাবার কাজটা এখনও বাকী; আর সেটা তার প্রতিশোধের আলো। কেবলমাত্র সেই প্রতিশোধের কথাই ভাবতে থাকে ক্লিম্‌শা। এই প্রতিশোধেই তার বিদ্রোহ। খনির অলিতে গলিতে কয়লার স্তূপের নীচের থামগুলোর গায়ে ঠেস্‌ দিয়ে দাঁড়ায় সে, ঘৃণার শব্দগুলোকে সে আর একবারের মত উচ্চারণ করে। ট্র্যাকগুলোর ধারে দাঁড়িয়ে ঘৃণার শব্দগুলো উচ্চারণ করে আর তারপরেই ট্রিগার চেপে ধরে গুলি ছোঁড়ে ক্লিম্‌শা।

তার উদ্ভাবন শেষ বারের মত কাজ করে। মোমের আবরণে মুড়ে কার্তুজের মধ্যে কাগজের যে প্রক্ষেপক ভরে রেখেছিল সে, সেটাই ক্লিম্‌শার ছিন্নভিন্ন দেহটাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তার অন্তিম ঘনিয়ে আসে। আর এভাবেই সব শেষ হয়ে যায়। ক্লিম্‌শা চেয়েছিল গোটা খনিটাতেই আগুন ধরিয়ে দিতে আর শুধুমাত্র সে নিজেই আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়; নিজেই শুধুমাত্র শিকারে পরিণত হয়। তার বিদ্রোহের অগ্নিশিখা খনির গর্ভদেশ থেকে ওপর পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিতে পারে না, তার মৃতদেহের ওপরই তা' নিঃশেষ হয়ে যায়।

যেভাবে সে এটা করল, তা' উদ্ভাবক ক্লিম্‌শাকে একজন ব্যতিক্রম হিসেবেই চিনিয়ে দিল; কিন্তু তার কাজটাই সব নয়। যেভাবে জুরাচেক-এর মত চাষী তাদের দুঃখকষ্টের জন্যে প্রতিশোধ নিতে গ্রামের মেয়রকে গুলি করেছিল, যেভাবে ক্ষুধা ও বেকারীর জন্যে সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে নপ্‌-এর মত সহকারী হোটেলগুলো বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, এটা ঠিক সেরকম একটা কাজ ছিল না। কিন্তু যদি একজন বেকার সেতুর রেলিঙ্‌-এ উঠে জলে ঝাঁপ দিতে চায়, যদি নিজেকে ফাঁসিতে লটকাতে চায়, নিজেকে গুলি করে মারতে চায়, নিজেকে হত্যা করতে চায় শুধুমাত্র তার নিজের ক্ষুধা ও দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্যে, তবে তা' কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

এই ব্যাপারটাকে সমস্ত সামর্থ দিয়েই আমাদের বুঝতে হবে। তুমি তরুণ যুবক যাকে খনি থেকে উৎখাত্‌ করা হয়েছে, তুমি ধাতু-শ্রমিক যার কাজ নেই, তুমি ক্ষুধার্ত চাষী, তুমি ছোট দোকানী যে দেনার দায়ে দেউলিয়া হয়ে গেছ, তুমি বেকার, তুমি হতাশায় নুয়ে পড়া মানুষ—তুমি যেই হও না কেন, তুমি একা নও। নিজের একার মুক্তির জন্যে মরণাস্ত্রের দিকে হাত বাড়িও না, তোমার দুর্ভাগ্যের জন্যে তোমার যুক্তিতে যাকে তুমি দায়ী বলে মনে করো তার ওপর প্রতিশোধ নিতে মারণাস্ত্রের দিকে হাত বাড়িও না। এমন 'একজন' যে তিনদিন কিছুই খায়নি এবং আগামীকাল যে রুটিতে একটা কামড় বসাতে পারবে এমন সম্ভাবনাও যার নেই, সে যদি আত্মহত্যা করে তাহলে সে একজন ভীরু আবার সে যদি একজনকে খুন করে তাহলেও সে ভীরু –এই কথাটা তাকে বোঝানো যে কতখানি নিষ্ঠুর কতখানি কষ্টকর আমি তা' বুঝতে পারি। আমি জানি, আমার ভালকরেই জানা আছে দুঃখকষ্টের বোঝা কিরকম অসহ্য হয়ে উঠতে পারে এবং কিভাবে তা' একটা মানুষকে ভেঙ্গেচুরে দুমড়ে মুচড়ে শেষ করে দিতে পারে। আমি এরকম অনেক কিছুই জানি যা' দিয়ে এই ধরণের আত্মহত্যা ও বিদ্রোহাত্মক হত্যার উন্মত্ততাকে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু সেগুলোর কোনটাই এই ধরণের কার্যকলাপকে যুক্তিবোধ্য করে তুলতে পারে না।

ঐ পথে ? না, না, ওপথে তুমি কখনই যেতে পারো না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমস্ত অপরাধীদের যে বোঝা তুমি কাঁধে করে নিয়ে বেড়াচ্ছো, এর দ্বারা তুমি কি তাদের পক্ষে সেটাই সহজ করে তুলবে না ? তোমার নিজের মৃত্যুর বিনিময়ে তুমি কি তাদের পাওনা মিটিয়ে দেবে না ? তোমার হতাশাকে কি তুমি খনির গভীরে টেনে নিয়ে যাবে এবং সেখানেই মৃত্যুকে বুকে টেনে নেবে ; আর যারা তোমাকে বঞ্চিত করেছে জীবনের সমস্ত কিছু থেকে, সূর্যকরোজ্জ্বল পৃথিবীর সব সৌন্দর্য থেকে, এর দ্বারা তুমি কি তাদের সুবিধেই করে দেবে না ? তুমি কি শুধু একা নিজেই মরবে না ? তুমি কি তাকিয়েও দেখছো না যে তোমার পাশেই রয়েছে তোমারই মত মানুষের এক বিশাল বাহিনী, যার প্রত্যেকেই তোমারই মত একা একা ধ্বংসের পথেই এগিয়ে চলেছে ? কিন্তু, যদি তাদেরকে জড়ো করা যায়, তবে সেটাই কি হতে পারে না এমন একটা বাহিনী যার রয়েছে সেই শক্তি ও ক্ষমতা যা' বেকারী ঘুচিয়ে এনে দিতে পারে কাজের প্রতিশ্রুতি, দারিদ্র্যের বুক চিরে এনে দিতে পারে প্রাচুর্যের দিন, মৃত্যুর শীতলতাকে দীর্ণ করে এনে দিতে পারে অসীম জীবনের উষ্ণতা ?

তুমি কিছুতেই কোন কারণেই ভেঙ্গে পড়তে পারনা। এটা হচ্ছে বিশ্বাস-ঘাতকতার সেই নোংরা ঐতিহ্য যা' সোস্যাল ডেমোক্র্যাট্‌রা বুর্জোয়াদের চরণে নিবেদন করেছিল, আর তা' হোল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আত্মবিশ্বাসের যে হাজার হাজার উপাদান ছিল তা' এরা লুঠ করে নিয়েছিল। যতদিন না পর্যন্ত ঐ সোস্যাল ডেমোক্র্যাট্‌রা এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পেরেছিল যে শ্রমিকশ্রেণী নির্বীর্য হয়ে পড়েছে, ততদিন পর্যন্ত তারা এটাই শ্রমিকদের বুঝিয়ে গেছে যে প্রতিরোধ করা ব্যাপারটাই হোল অর্থহীন। এমনকি যখন তাদের চোখ খুলে দেওয়া হোল এবং তারা নিজেরাও বুঝতে পারল যে তারা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছিল, তখনও ঐক্য ও সংহতির প্রতি দুঃখজনক এক গভীর অবিশ্বাস তাদের মনে দৃঢ় হয়েই থেকে গিয়েছিল। তাদের মনে হতাশার এমন এক আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছিল যে তারা এমনভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল ও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, যে শুধুমাত্র আত্মহত্যা ও ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার কথাই তারা ভাবতে পারত। অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার এই নিদারুণ অভিশাপকে আমাদের ভাঙ্‌তেই হবে ; যে অবিশ্বাস চেপে বসেছে তাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলতেই হবে। আমাদের এটা জানতে ও বুঝতে হবেই যে আমাদের মধ্যে ক'জন রয়েছি একই দুঃখকষ্টের মধ্যে এবং মনের মধ্যে লালন করছি একই ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে।

সেই বেকার মজুর কারেল ক্লিম্‌শার ছিন্নভিন্ন ও দগ্ধ দেহাবশেষকে সমাধিস্থ

করতে জড়ো হয়েছিল ওস্ত্রোভার পঁয়ত্রিশ হাজার শ্রমিক। তোমরা যারা গত সন্ধ্যায় ফ্রাইদেক্-এর পথে আমার সাথী ছিলে তারাও তাদের মধ্যে ছিলে। তোমরা কি মনে কর? তোমরা কি মনে কর তার গুলিবর্ষণ কোনও ভাবে তোমাদের সাহায্য করেছে? তোমরা কি কাজ পেয়েছো? তারা কি তোমাদের সংগে মানুষের মত আচরণ করছে? না, তোমরা অবশ্যই বলবে—না, তারা তা' করছে না—বলবে, আমি কাজ পাইনি, ওটা কোন কাজেই আসেনি। উত্তরের কমরেডদের জিগ্যেস্ করো—যখন বেকারীর বিরুদ্ধে তারা এক বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, তখন ঐ আন্দোলন কি তাদের কোন কাজে এসেছিল? ক্লিম্‌শার শেষকৃত্যে যতজন ছিল তাদের আন্দোলনেও ছিল ততজন। তবে তারা ছিল ঐক্যবদ্ধ ও পরস্পরের প্রতি তাদের ছিল বিশ্বাস ও আস্থা। ঐ ঐক্য ও বিশ্বাস কি কোন কাজে লেগেছিল? হ্যাঁ, লেগেছিল। সেই ঐক্য ও বিশ্বাস নিজেদেরকে রক্ষা করার কাজটাই করেছিল। একটা সংগ্রাম যতটুকু সাহায্য করতে পারে ওটা তাই করতে পেরেছিল, আর আজ তোমরা যতজন রয়েছো সেই সংগ্রামে তাদেরও ততজনই ছিল। আজকে তুমি ও লক্ষ লক্ষ মানুষ অবিশ্বাস ও বিবেকবোধের মধ্যে যেভাবে আন্দোলিত হোচ্ছ, সেদিন তারাও সেভাবেই আন্দোলিত হয়েছিল। তারাও হয়ত নিঃশেষ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু একসঙ্গে তোমরা সবাই কখনও নিঃশেষ হয়ে যেতে পারোনা।

তোমাদের সবাইয়ের মধ্যে একত্রে যে শক্তি রয়েছে, তাকে কখনও পরাজিত করা যাবে না, আর এটা তোমাদের বুঝতে হবে, অবশ্যই বুঝতে হবে। যারা এখনও বুঝে উঠতে পারেনি তোমার জ্ঞানকে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তোমার বিশ্বাসকে পৌঁছে দিতে হবে অন্যদের কাছে। নির্বীর্যতার চেপে বসা সেই অনুভূতিটাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলতে হবে। আমাদের সবাইকেই শুধুমাত্র একটা বিরাট কাজ করতে হবে: আমরা কেউই খনির ইঞ্জিনিয়ারকে হত্যা করব না এবং খনির তলায় ঐ রকম দুঃখজনক মৃত্যুকেও আকড়ে ধরব না।

হতাশায় লোকে যেভাবে মরে আমরা সেভাবে মরব না।

সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানুষ যেভাবে জেতে সেভাবেই আমরা জিত্‌বো!

দ্বিতীয় অংশ

ইয়াউ-ডি-কোলনের বোতল

তুমি বোধহয় ঘুমিয়েই পড়লে।

ট্রেনটা যেন একজন অক্লান্ত স্নেহার্ত্ত মাতা। ঘুমের ঘোরে তোমার শ্রবণশক্তি ক্ষীণ হয়ে এলেও তুমি শুনতে পাও ট্রেনের ট্রেনের ছন্দময় সঙ্গীত। সে সঙ্গীত বেজে চলে ধীরে ধীরে পেলব ভঙ্গীতে আর তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে সোভিয়েত রেল ওয়াগনের প্রশস্ত গদিতে। স্তেপ্‌ভূমির সুরেলা সঙ্গীত একঘেয়ে বেজেই চলে।

সে এক ধূসর-সবুজ সুরের মূর্চ্ছনা।

সেই সঙ্গীত শুনতে শুনতে দশম ঘণ্টাটা ঘনিয়ে আসে। তোমার চোখ দু'টো ঘুমে প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আসে।

রাত এগিয়ে আসে, আসে স্বাভাবিক নিয়মেই ··· সোভিয়েত রেলপথে সাপ্তাহিক তীর্থযাত্রায় সবকিছুই এরকম নিয়মমাফিকই ঘটে যায় : ঘুম !

কিন্তু তোমার বাঙ্কের ঠিক উল্টোদিকে দু'নম্বর বাঙ্কে যে লোকটা শুয়ে আছে, সে কিন্তু তোমাকে ঘুমোতে দেবে না। যেভাবেই তুমি তার দিকে তাকাও না কেন সে তোমার চোখকে আটকে রাখবেই।

কুরাজ্‌লি-রাজেদ্‌

চারদিকে বিস্তীর্ণ স্তেপ্‌ভূমির মাঝখানে দু'টো টানা রেললাইন আর একটা বাড়ী নিয়ে ছোট্ট একটা স্টেশন। তুমি পড়েছিলে তার গায়ে লেখা 'কুরাজ্‌লি-রাজেদ্‌'। তোমার নতুন সহযাত্রীটি এখান থেকেই ট্রেনে উঠেছিল। সঙ্গে ছিল একটা কুকুর। লোকটা যদি কুরাজ্‌লি-রাজেদ্‌-এর বাসিন্দা হয়ে থাকে, তাহলে যে মুহূর্তে সে জায়গাটা ছেড়েছে সেই মুহূর্তেই নিশ্চিতভাবে কুরাজ্‌লি-রাজেদ্‌কে গ্রাস করেছে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা। আর যদি সে তা না হয়ে থাকে তবে এ প্রশ্নটা অবশ্য থেকেই যায় যে তাহলে স্তেপ্‌ভূমির এই ধূসর সবুজ সমুদ্রের মধ্যে এই জনমানবহীন স্থানে সে এলোই বা কি করে ?

দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল লোকটা দারুণ ক্লান্ত। লোকটার রয়েছে একজোড়া কোটরাগত চোখ আর নাকের তলা থেকে কুঞ্চিত চামড়ার ঢেউ অন্তর্হিত হয়েছে চুলের আবরণের আড়ালে।

তাকে দেখে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, সে আসলে ক্লান্ত না অসুস্থ। তবে এটা ঠিক সে একদমই ঘুমোচ্ছে না।

তার কব্জিতে আঁটা একটা হাতঘড়ি, তার কাঁচটা আবার খুলে বেরিয়ে এসেছে। ঘড়িটার ওপর চোখ রাখলেই তুমি দেখতে পাও যে একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সে উঠে পড়ছে আর একটা জীর্ণ বাক্সের মধ্যে থেকে তাড়াতাড়ি অথচ সাবধানে একটা বোতলকে বার করছিল। বোতলটাতে একদিন ইয়াউ ডি-কোলন ছিল, কিন্তু এখন তাতে রয়েছে কালো অথচ উজ্জ্বল এক আশ্চর্যজনক তরল পদার্থ। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিদের প্রেরণা ও সাদামাটা লোকজনদের শান্তিপূর্ণ বিশ্রামের জন্যে অস্তগামী সূর্য ছিটিয়ে দিচ্ছে শেষ রশ্মিচ্ছটা ; আর সে সন্তর্পণে সূর্যের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে বোতলটাকে।

সত্যিই যেমন আশ্চর্যজনক লোকটা, সেরকমই রহস্যময় তার বোতলটা।

কৌতূহলের রহস্য-ঘেরা এই অচেনা লোকটার গোপনীয় ব্যাপারটাকে জানার জন্যে তুমি নিশ্চয়ই উদগ্রীব হয়ে উঠেছো, কারণ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সোভিয়েত রেলপথে সাপ্তাহিক তীর্থযাত্রার নিয়মের বাঁধনে তোমাকে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। তাই তোমার বক্তব্যটা আপনা থেকেই তৈরী হয়ে যায়ঃ

"আপনার ওটা কি ? বোতলে ওটা কি রেখেছেন ? আমার তো মনে হয় ওটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের কোন তরল পদার্থ—কি বলেন ?

"হ্যাঁ, তা যা বলেছেন, এটা হোল কিনা …"

তুমি হয়ত ভাবছ, এতক্ষণ সে তোমার উপস্থিতি লক্ষ্যই করেনি ; কিন্তু এখন এমনভাবে সে প্রশ্নটার উত্তর দিচ্ছে যে মনে হচ্ছে সে যেন তোমার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর কথাবার্তায় ডুবে ছিল এবং তোমার কথা বলা শেষ করার আগেই যাতে সে উত্তর দেওয়া শুরু করতে পারে এর জন্যে তোমার প্রশ্নটির প্রতি সে যেন মুখিয়েই বসে ছিল।

সেই মুহূর্তে তোমার অজ্ঞাতসারে স্তেপ্‌ভূমিতে প্রথম রাতের ঘুমকে তুমি বিদায় জানিয়ে ফেলেছো।

সে আসছে লেনিনগ্রাদ থেকে। বয়স তার তিরিশ।

সে কথা বলে ধীরে সুস্থে। এক হাজার এক রাত ধরে তুমি যে গল্প শুনবে—যা' কোন রূপকথা নয়, যা' নতুন বীরদের সত্যি কাহিনী, তারই প্রথম রাতের কাহিনী সে বলতে চায় ; যা' তার নিজের তিরিশ বছরের ঘটনাবহুল জীবনেরই কাহিনী।

সে একজন ভূতত্ত্ববিদ। তার কাজ তেল খুঁজে বেড়ানো। সে যেন একটা যাদুদণ্ড, যেখানেই তেল থাকা সম্পর্কে সে নিশ্চিত মতামত দিয়েছে, দেখা গেছে কয়েক সপ্তাহ পরে সেখানেই স্রোতধারায় তেল বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এখন তাকে পাঠানো হচ্ছে কাজাকাস্তানে, আর স্তেপ্‌ভূমির ওপর দিয়ে সে সেখানেই চলেছে। এই জায়গাটার নাম এম্বা অঞ্চল। এম্বা নদীর নাম থেকেই এই অঞ্চলটার নামের উৎপত্তি। উত্তর-পূর্বে কাস্পিয়ান সাগরের কূল থেকে ওরেনবার্গ-তাসখন্দ রেলপথ পর্যন্ত সত্তর হাজার বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী বিশাল অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে মৌচাকের মত খোপে খোপে পরিপূর্ণ তেলের কূপ।

যদিও এই সম্পদের কথা অনেকদিন আগে থেকেই জানা ছিল। জারের রাশিয়ায় একসময় তারা এখানে তেলের খোঁজ করেছিল। তারা কুড়ি মিটার খুঁড়েও ছিল। কাজটা করছিল একটা ব্রিটিশ কোম্পানী, কিন্তু তারা হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

তবে তারা ঠিক ইচ্ছে করে ছেড়ে দেয়নি—তারা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। এখানে জীবনধারণ করাটা খুব কষ্টকর, খুউব কষ্টকর। আর তাই শুধুমাত্র পেত্রোগাদের ভূতত্ত্ববিদদের কাগজে কলমেই তেল থেকে গেল।

তারপর পেত্রোগাদ রূপান্তরিত হোল লেনিনগ্রাদে।

এলো পাঁচ-সালা পরিকল্পনা। কমরেড, আমরা যা' করতে সক্ষম সেরকম কোন কিছুকেই পরিকল্পনার বাইরে রাখা হোল না। আমরা নিজেদেরকে এম্বা অঞ্চলে নিক্ষেপ করলাম।

হ্যাঁ, তারা নিজেদেরকে এম্বা অঞ্চলে নিক্ষেপই করেছিল। অর্থাৎ তার অর্থ ছিল—জীবন উৎসর্গ কর! দু'তিন বছরের জন্যে জীবনের কথা ভুলে যাও। কে জানে শেষ পর্যন্ত তুমি বেঁচে ফিরবে কিনা!

শ্রমিকদের এই অঞ্চলে পাঠানোর কাজটাই ছিল অসম্ভব এক ব্যাপার। যেখানে খননকার্য চলে, সেখানের সঙ্গে অন্য জায়গার কোন যোগাযোগই থাকে না। এখানে নেই কোন জনবসতি, রয়েছে শুধুমাত্র বিস্তীর্ণ স্তেপ্‌ভূমি। আর এই স্তেপ্‌ভূমিতে রেলপথ থেকে ষাট ভার্স্ট দূরে থেকে মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়, কাজ করতে হয়। সরবরাহ·· আছে, তবে তাও এক কঠিন সমস্যা, অত্যন্ত কঠিন। এমন সময়ও আসা অসম্ভব নয় যখন পেট ভরাবার কিছুই থাকবে না, আর তুমি নিজে কখনই আগে থেকে জানতে পারবে না ঐ দূর নিঃসঙ্গতার মধ্যে আর কি কি ঘটতে পারে—তুমি হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়তে পার অথচ সবচেয়ে কাছের হাসপাতালে পৌঁছতেই কম করে দু'দিন লেগে যাবে। না, এরকম জায়গায় শ্রমিকদের পাঠানোর ব্যাপারটা কোন দিক দিয়েই সহজ ছিল না।

কে নিজে থেকে যাবে?

সাতশো লোক যাবার দরখাস্ত করেছিল। কিন্তু দরকার মাত্র সত্তর জন।

এটা দ্বিতীয় বছর চলছে। রেলপথ থেকে ষাট ভার্স্ট দূরে স্তেপ্‌ভূমিতে বাস করছে সত্তর জন শ্রমিক। প্রথম দু'মাস তো তাদের খোলা আকাশের নীচেই ঘুমোতে হোল। এমনকি তাদের তাঁবু পর্যন্ত ছিল না। এখন অবশ্য তাঁবু ও কাঠের কুটীর রয়েছে। এখানের জলে তুমি পাবে তেলের স্বাদ। পাঁউরুটি তাদের কাছে পৌঁছোনোর আগেই শক্ত কঠিন হয়ে যায়। এমনও দিন গেছে যখন তীব্র তুষারঝড় তাদের তাঁবুগুলোকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে, তীক্ষ্ণ শীতের ঝাপটানি দেহগুলোকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। এমনও দিন গেছে যখন জল ফুরিয়ে গেছে, হাঁটু গেড়ে বসে উট ও দীর্ঘ সিংওয়ালা ভেড়ার সংগে একই সাথে নদীর কাদাগোলা জলে তেষ্টা মেটাতে হয়েছে। এমন দিন গেছে যখন টাট্‌কা সরবরাহ বোঝাই ঠেলাগাড়ী

স্তেপের তুষারস্তূপে চাপা পড়ছে অথবা উরালের তুষারখাদে ট্রেন আটকা পড়ছে। আর ক্ষুধায় তাদের ছট্‌ফট্‌ করতে হয়েছে। পুরোনো খবরের কাগজের টুকরো পাকিয়ে তার মধ্যে স্তেপ্‌ভূমির শুকনো ঘাসের টুকরো ভরে ঐ আদ্দিকালের সিগারেটের ধোঁয়ায় পেট ভরাতে হয়েছে।

এটা দ্বিতীয় বছর চলছে। রেলপথ থেকে ষাট ভার্স্ট দূরে স্তেপ্‌ভূমিতে দিন কাটাচ্ছে সত্তর জন শ্রমিক। একজনও ছেড়ে যায়নি।

স্তেপ্‌ হোল পৃথিবীর এক রহস্যময় অংশ। বলা হয় যে পামীরের মানচিত্র প্রস্তুত করার কাজটাই শুধুমাত্র নাকি বাকী রয়েছে, কিন্তু না কমরেড, এই স্তেপ্‌-ভূমির মানচিত্রটা প্রস্তুত করার কাজটাও বাকী রয়েছে। পুরোনো টোপোগ্রাফাররা শুধুমাত্র কল্পনা দিয়েই স্তেপ্‌ভূমির মানচিত্রটা প্রস্তুত করেছিলেন। শুধুমাত্র এখনই হাজার হাজার কিলোমিটার ব্যাপী এই অনন্ত স্তেপ্‌ভূমির নতুন ও সঠিক মানচিত্র তৈরী করা হচ্ছে। এই ক্যাম্পের স্বেচ্ছাসেবী শ্রমিকদের মধ্যে রয়েছেন দু'জন তরুণ টোপোগ্রাফার। তারা কাজ করছেন আবার দরকার মত খোঁড়াখুঁড়ির কাজে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখছেন। তাদের হাতেই জন্ম নিচ্ছে নতুন ও সঠিক এক মানচিত্র। বিশ্বচিত্রে জন্ম নিচ্ছে এক নতুন বৈশিষ্ট্য।

"আমরা জয় করছি এই ভূখণ্ডকে।"

কথাগুলো সে বল্‌লো অত্যন্ত সাদামাটাভাবে, বলতে গেলে স্রেফ কথা বলার তাগিদেই যেন সে বলে ফেল্‌লো কথাগুলো।

গত বছর শীতকালের ছুটিতে সে লেনিনগ্রাদে গিয়েছিল। বেশ কয়েক মাস পরে তার হাতে এলো তাজা খবরে ভরা একখানা খবরের কাগজ। তাতে "পাঁচ-সালা পরিকল্পনায় সাফল্য"র ওপর স্তালিনের একটা বক্তৃতা ছাপা হয়েছিল। সমস্ত পরিসংখ্যানটাকেই সে তার নোটবুকে টুকে নিয়েছিল।

"যখন সূর্য ঠিক মাথার ওপর থাকে এবং কাজ থেকে আমাদের সরিয়ে রাখে, তখন আমরা ওগুলো নিয়ে আলোচনা করি, আর এতেই আমরা দারুণ শক্তি পাই। যদিও আমি ঠিক জানি না, অন্যেরাও আমাদেরই মত একই অনুভূতিতে সাড়া দেয় কিনা, কিন্তু আমরা যারা অনেকদিন আগেই নিজেদের ব্যক্তিগত কাহিনীর সবটুকুই বলে ফেলেছি এবং এইরকম নিদারুণ নিঃসঙ্গতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি তাদের কাছে এটাই শক্তি যোগায়। পরিকল্পনার প্রথম বছরে যা' যা' করার ছিল তা' তো আমরা করলামই, উপরন্তু সে-সবকে ছাড়িয়েও গেলাম। এখন, নিশ্চয়ই তুমি আমাকে অর্থাৎ আমাদের পরিকল্পনাকে বুঝতে পারছ। জান, যা' কিছু গতিময় এরকম সব কিছু থেকেই হয়ত আমাদের বিচ্ছিন্ন করা যাবে, কিন্তু, পরিকল্পনা—সেটা তো আমরা

নিজেরাই, আমরাই তো তার অংশ, তাই কোন কিছুই তার সজীব স্পর্শ থেকে আমাদের ছিনিয়ে নিতে পারবে না।"

আমি তাকে বললাম—আমাকে একজন কল্পনাবিলাসী ইস্কুলের মেয়ে ভেবো না। তাছাড়া এধরণের উৎসাহের সঙ্গে আত্ম-অস্বীকৃতির ব্যাপারটা বাস্তবে আর যাই হোক, বিশ্বাস করাটা বেশ কষ্টকর। সে অবশ্য এ কথায় রাগ করল না, কিন্তু কিছুটা তিক্ততা মেশানো গলায় বল্‌লো :

"তাহলে, সম্ভবতঃ তুমি আমার কথা কিছুই বুঝতে পারোনি। আসলে, তোমরা শুধু এটাকেই স্বাভাবিক মনে কর যে, লোকজনেরা শুধুমাত্র যুদ্ধের সময়েই যত কষ্ট করতে পারে। হত্যার উন্মাদনায় তারা যখন নিজেদেরকে ভুলে যায়, তাই পারে। আর সেজন্যেই তোমরা বিশ্বাস করতে পার না যে, সৃষ্টির প্রবল আকাংক্ষাতেও কেউ আত্মত্যাগ করতে পারে।"

"শোন, সোভিয়েত ভূখণ্ডে তোমার ভ্রমণের সবেমাত্র প্রথম কয়েকটা দিন কেটেছে। তাই তোমার মনে সন্দেহ থাকবেই।"

"শোন, আমরা এখন আর অতটা নিঃসঙ্গ নই। সম্প্রতি আমাদের এক নতুন প্রতিবেশী জুটেছে। এক নতুন রাষ্ট্রীয় খামার গড়ে উঠেছে—জারান্ট নাম্বার টু। মাত্র ছ' মাস আগে এই খামার গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়, আর আজকে সেখানে শস্য ফলছে। সোভিয়েতের মানুষ স্তেপ্‌ভূমির একটা নতুন অঞ্চলকে জয় করে নিয়েছে। এখন থেকে আমাদের প্রয়োজনের যথেষ্ট রুটি আমরা পাব। ব্যর্থতার হতাশায় আমাদের আর হা-পিত্যেস করে বসে থাকতে হবে না। তুমি যদি আগামী দশ বছরের মধ্যে এখানে আস তাহলে তুমি আর সেই স্তেপ্‌ভূমি দেখতে পাবে না যেখানে সূর্যের দাবাদহ আর নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্নতার একটানা রাজত্ব চলছে। দেখবে মানুষের তৈরী নগর গড়ে উঠেছে সেখানে।"

বাইরে তখন রাত্রি ও স্তেপ্‌ভূমি। অক্লান্ত স্নেহার্ত মাতার মত ট্রেন। আর সামনে সেই মানুষটা, তার সূর্যদগ্ধ ও বিক্ষত মুখমণ্ডল ও ক্লান্ত চোখজোড়া নিয়ে দিনের উজ্জ্বলতাকে ছাপিয়ে আরও বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

বোতলটা তার হাতেই জ্বল জ্বল করতে থাকল।

"আঃ সত্যিই বোতলটা!" সুখের হাসি হাসতে হাসতে বলল সে, "কমরেড, এটাই আমাকে একঘেয়েমি আর বিরক্তি থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করছে।"

"বলতে গেলে এই বোতলটার কারণেই আমাকে ট্রেনে চাপতে হয়েছে। আর এই বোতলটার দৌলতেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলাম। স্তেপ্‌ভূমির ওপর দিয়ে ষাট ভার্স্ট পথ পেরিয়ে এলাম, কিন্তু একজনও মানুষের

দেখা পেলাম না যাকে আমাদের সেই বিরাট পুরস্কার পাওয়ার খবরটা আমি দিতে পারতাম·· ।

এই প্রথম তাকে আস্তে আস্তে কথা বলতে দেখলাম।

"কমরেড, এই বোতলটাতে যা' রয়েছে তা' হোল তেল—সবচেয়ে খাঁটি তেল, যা পৃথিবীর আর কোথাও নেই ···

"·· আজ সকালে আমরা একে আবিষ্কার করেছি।"

"ঠিক যেখানটায় কয়েক বছর আগে ব্রিটিশরা খুঁড়তে শুরু করেছিল, আজ সকালে সেখানেই বিশুদ্ধ তেলের প্রবাহ মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো, আর তীব্র ধারায় আদিগন্ত স্তেপ্‌ভূমির বুকের ওপর দিয়ে ছুটে গেল।"

"ওরা একদল বুদ্ধু, মাত্র কুড়ি মিটার খুঁড়েই ওরা পৃথিবীর বিশুদ্ধতম তেলের উৎসটাকে হাতছাড়া করেছিল, আর পাঁচ-সালা পরিকল্পনার কল্যাণে সেটাকেই আবিষ্কার করা গেল।"

যে ঊষর ভূমিখণ্ড তাকে এই পুরস্কার যুগিয়েছে, সেখানে নিজের জীবনের কতটা সে কাটিয়েছে সে বিষয়ে একটা কথাও সে বল্‌লো না। এও মনে হোল যে, বাকী পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে শুধুমাত্র নিজেদের শ্রমের বিনিময়ে পাঁচ-সালা পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে যে সত্তর জন শ্রমিক ও বিশেষজ্ঞ সেখানে দিনের পর দিন কাজ করে চলেছে, তাদের কথা বলারও কোন প্রয়োজনই তার কাছে নেই। একথা বলাও তার কাছে নিরর্থক মনে হোল যে বৃটিশরা তাদের প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে যে ব্যাপারটা গুটিয়ে নিয়েছিল শুধুমাত্র নিঃস্বার্থ উৎসাহকে সম্বল করেই সে কাজটা তারা সার্থক করে তুলতে পেরেছে।

ব্রিটিশরা ছেড়েই দিয়েছিল। তবুও যাতে আর কেউ জায়গাটাকে খুঁজে না পায়, সেজন্য তারা চেষ্টার ত্রুটি করেনি। গর্তটাকে তারা মাটি দিয়ে শুধুমাত্র ভরাট করেই দেয়নি, উপরন্তু প্রকৃত জায়গাটার বদলে অন্য একটা জায়গাকে মানচিত্রে চিহ্নিত করে রেখেছিল।

কিন্তু এত কিছু করা সত্ত্বেও জায়গাটাকে খুঁজে পাওয়া গেলই। এই নতুন আবিষ্কারের কাহিনী, এটাই তোমাকে শুনতে হবে।

আসলে আবিষ্কারক হোল ঐ কুকুরটা।

হ্যাঁ, ঐ কুকুরটা, যে আমাদের কম্পার্টমেন্টের সামনের ওয়াগনের বারান্দায় শুয়ে রয়েছে। আজ যার কাছে রয়েছে বিশুদ্ধতম তেল, সেই লোকটার সঙ্গে কুকুরটা তিন তিনটে বছর ধরে রয়েছে। কুকুরটা লক্ষ্য করত যে তার মনিব নীচু হয়ে নুড়ি পাথর কুড়োত। যে সব পাথর কুকুরটার ভাল লাগত সেগুলোই সে তার

মনিবের কাছে নিয়ে আসত। সে লক্ষ্য করত সেই পাথরগুলোর কতগুলোকে তার মনিব মোটেই পছন্দ করত না ও ছুঁড়ে ফেলে দিত। অন্যগুলোকে সেই ভূতাত্ত্বিক মনিব পকেটে পুরে ফেলত, কারণ ঐগুলোর নিশ্চয়ই কোন মূল্য তার কাছে থাকত। আর এভাবেই কুকুরটা পাথরগুলোকে বাছতে শিখেছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই সে সেইসব পাথরগুলোকেই চিনতে শিখল যাদের মধ্যে তেলের উপস্থিতির নিশানা থাকত। ঐ বিশেষ ধরণের পাথরগুলোকেই সে খুঁজে আনত আর যেখান থেকে সেগুলো পেত সেই জায়গাগুলোকেও চিহ্নিত করে রাখত। সে সব সময়েই মাটিতে থুত্‌নি ছুঁইয়ে ঘুরে বেড়াত। একদিন সে এমন একটা পাথর নিয়ে এলো, যা' শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশদের পরিত্যক্ত সেই জায়গাটাতেই তাদের নিয়ে গেল।

এভাবেই তারা পৃথিবীর বিশুদ্ধতম তেলের উৎসে গিয়ে পৌঁছল।

"দেখ, দেখ, ঐ যে আমার সাহায্যকারী। না, না, ওকে আর কুকুর বোল না, ওযে আমার সহকর্মী।"

অনেক দিন ধরেই খোঁড়ার কাজ চালাতে হোল। উৎসটা মাটির অনেক গভীরে লুকিয়ে ছিল। শুধুমাত্র আজ সকালেই তার দেখা মিলল। তারা দেখল বিশুদ্ধ, একেবারে বিশুদ্ধ তেল।

আনন্দে সেই ভূতত্ত্ববিদ শিহরিত হোল। আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো, কোথাও কোন পাত্র পাওয়া যায় কিনা। তাকে আর বেশী ইতস্ততঃ করতে হোল না পকেটেই ছিল ইয়াউ-ডি-কোলনের একটা বোতল। স্তেপ্‌ভূমিতে ওটা ছিল এক বিলাস-সামগ্রী বিশেষ, যা' স্তেপ্‌ভূমিতে তাকে দিতে পার্থিব আনন্দের ছোঁয়া। ওটা ছিল সভ্যজগতের একটা সস্তা নিদর্শন যা' তার দাড়িগোঁফওয়ালা গালে বুলিয়ে দিতে এক ধরণের মানসিক তৃপ্তির প্রলেপ। মুহূর্তের মধ্যে সে ভুলে গেল সেই আবেগ ও তৃপ্তির কথা, বোতলটার মুখ খুলে সবটাই ঢেলে দিল রুক্ষ মাটির ওপর। লোভী সূর্য ও শুকনো মাটি তার শেষ বিন্দুটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নিল। আর খালি বোতলে ভরা হোল তেল।

আর এটাই হোল সে ইয়াউ-ডি-কোলনের বোতল, যা' সঙ্গে নিয়ে এই অঞ্চলের দ্বিতীয় অংশটার ওপর দিয়ে সে এখন চলেছে। সে চলেছে নিজেকে উপস্থিত করতে, নিজের মতামত রাখতে ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ চাইতে।

এখন সে নিজেই চলেছে। কিছুদিন আগে এটাও সহজ ছিল না। সেই এলাকায় সেই ছিল তখন একমাত্র ভূতত্ত্ববিদ, আর তার সাহায্যকারীরা সবাই ছিল ছাত্র। ছ'মাস তাদের লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটাতে হোল, বাকী ছ' মাস

কাজ করতে হোল এখানে। তারপর আরও ছ'মাস তাদের কাট্‌লো লেনিনগ্রাদে ও পরের ছ'মাস এম্বায়! এখন এখানে রয়েছে দু'জন খুবই দায়িত্বসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ার।

আমাকে সবকিছু বলার তাগিদে তাকে ওটাও বলতে হোল, বলতে হোল দ্বিতীয় ব্যক্তিটাই বা কে।

গত যুদ্ধ পর্যন্ত সেই লোকটাকে মাঠেঘাটেই কাটাতে হয়েছিল। লোকটা ছিল একজন কৃষি-শ্রমিক। তার ভাগ্যে জুটেছিল শুধুমাত্র তিন বছরের স্কুল-জীবন, তাও গ্রামের ইস্কুলে। আর তুমি জানোই জারের রাশিয়ায় তার হালও ছিল কিরকম।

এদিকে যুদ্ধ এসে গেল। সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধক্ষেত্রের কত ঝড়ঝাপ্‌টাই না তার ওপর দিয়ে চলে গেল। গৃহযুদ্ধেও সে বেশ সক্রিয়ভাবেই যোগ দিল।

রেড্‌ গার্ড হিসেবেই দুনিয়ার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটল। সে আবিষ্কার করল যে মানুষের মধ্যে রয়েছে আরও অনেক সামর্থ ও সম্ভাবনা যা' ক্ষেতেখামারে ভালভাবে ফসল ফলানোর চেয়েও অনেক বেশী কার্যকরী। সে এটা বুঝল, তার সামনে খোলা রয়েছে এগিয়ে চলার পথ। সে নিজেও ছিল প্রতিভাবান আর সেটা সে বুঝতোও। ঠিক করে ফেলল যে সে পড়াশুনা করবে।

শুধুমাত্র পায়ে হেঁটেই একশো পঞ্চাশ ভার্স্ট পথ পেরিয়ে সে চলে এলো এক শহরে। সেখানে ছিল একটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও তার প্রতিভার আন্দাজ করতে পারলো। এটা লক্ষ্য করা গেল যে গ্রামের ইস্কুলে তার পড়াশুনার যে প্রথম ভিত্‌ গড়া হয়েছিল, তা' জারের রাশিয়ার অন্যান্য ইস্কুলের থেকে আলাদা কিছু ছিল না। তাই ওটা কোন কাজের ব্যাপার ছিল না। কোনও রকমে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে পড়ত সে আর লিখতে পারতোই না।

সে একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করল। প্রথমে পড়তে ও লিখতে শিখল। তারপর সেকেণ্ডারী স্কুল এবং সবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়। গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে খুবই তাড়াতাড়ি অথচ নিখুঁতভাবে সে তার পড়াশুনা শেষ করল। তারপর অনুশীলনের উদ্দেশ্যে তাকে পাঠানো হোল এম্বা অঞ্চলে। সে তার যোগ্যতার প্রমাণ দিল। তার সম্পর্কে লেনিনগ্রাদে লিখে পাঠানো হোল তাকে আরও কয়েকমাস যেন ঐ অঞ্চলে রেখে দেওয়া হয়; কারণ ওখানে তাকে খুবই প্রয়োজন ছিল। অথচ ইতিমধ্যে শরতে তার আবার স্কুলে যোগ দেওয়ার কথা—ছ'মাসের তাত্ত্বিক পড়াশুনা তার তখনও বাকী ছিল।

কিন্তু তাকে আর যেতে হোল না।

এদিকে কয়েকদিন হোল একজন কাজাখ্ পত্রবাহক তার জন্যে এক তারবার্তা নিয়ে এসেছে।

"কমরেড, যদি তুমি আমাদের কিছু লিখতে চাও কখনও তারবার্তা পাঠিয়ো না, কারণ ওটা ততদিনই কুরাজ্‌লি-রাজেদ্-এ পড়ে থাকবে, যতদিন না পর্যন্ত সরবরাহের এমন একটা স্তূপ জমে ওঠে যাতে করে ওগুলোকে পৌঁছে দেওয়ার কাজটা কার্যকরী অর্থে করা যেতে পারে। চিঠিপত্র, তারবার্তা সবই ওখানে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় পড়ে থাকে। বলতে গেলে, আমরা যেন বাবিক আর কুরাজ্‌লি-রাজেদ্ আমাদের পোতাশ্রয়। আর তারবার্তা পাঠিয়ো না। অযথাই তুমি তারের সংযোগপথকে ভারাক্রান্ত করেছ···ইত্যাদি।" এরকমই ছিল ব্যাপারটা।

তার তারবার্তাটাও যথারীতি সেখানেই পড়ে ছিল। সেটাকে সে পেল পক্ষকাল দেরীতে। ছত্রিশ বছরের সেই ছাত্র, নিষ্প্রভ চাঞ্চল্যে তেল-জ্যবজেবে হাত দু'টো ট্রাউজারে মুছতে মুছতে তারবার্তাটা খুলে ফেলল।

অনেকক্ষণ ধরেই সে হাসতে থাকলো। তার রৌদ্রদগ্ধ মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণের রক্তিমাভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

সেই তারবার্তায়, তারা জানিয়েছে যে, সে যে কাজ করেছে তাতেই সে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের যোগ্যতা অর্জন করেছে।

ঘড়িতে তখন রাত দু'টো। পূর্বাঞ্চলে তখন ভোর চারটে। ভূতত্ত্ববিদের কাচবিহীন ঘড়িতে সেইরকমই সময়ের আভাস।

বাইরের নীলে লাল রঙের ছোপ লেগেছে। এক টুকরো লাল আলোর রেখা জানলার ফাঁক দিয়ে ভেতরে এসে পড়েছে। সূর্য উঠছে।

"দিনে বারো ঘণ্টাও আমরা এখানে কাজ করে থাকি। কখনও কখনও আরো বেশী। আমরা কখনই ঘড়ি ধরে কাজ করিনা আর আমরা কেউই ওভাবে ভাবিও না। আসলে কেউইতো আমাদের কাজ করতে বাধ্য করে না—কাজের তাগিদেই আমরা কাজ করে যাই। এটাই আমরা বুঝি যে তেলের উৎসের দিকে আরও এক মিটার বেশী গভীরে পৌঁছোনোর অর্থ হোল সমাজতন্ত্রের দিকে আর একটু এগিয়ে যাওয়া। তুমি কি মনে কর কমরেড, আমি যা' বলছি তা' আসলে একটা বাক্-চাতুরী? না, কমরেড! এটাই আমাদের জীবন। আমাদের আরাম করার কিছু নেই, ভোগ করার মত কোন সম্পদও নেই। এমনকি আমাদের সঙ্গে ভালবাসার নারীও নেই। এটাকেও নিশ্চয়ই ছোট করে দেখবেনা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমাদের আছে ভালবাসার জিনিষ, আর তা' হোল তেল। আর এই তেলকেই আমরা প্রকৃত অর্থে ভালবাসি। তুমি প্রথমে যা' বলেছিলে তাতে

আমি কিছুটা মুসড়ে পড়েছিলাম বৈকি, তা সত্ত্বেও আমি নিজেকে সামলে রেখেছিলাম। আমার সন্দেহ হয়েছিল যে তোমার প্রতি আমার যতটা যত্নবান হওয়া উচিত ছিল, হয়ত ততটা হতে পারছিলাম না। স্তেপ্ এমন একটা জায়গা যেখানে তোমাকে শিখতেই হবে যে কোন কিছুকেই অতিরঞ্জিত করতে নেই। এখানে তোমাকে শিখতেই হবে যে এমন কি নিজের কাছেও মিথ্যে বলতে নেই। স্তেপ্ এমন এক জায়গা যেখানে চিন্তাভাবনা করতে হয় সবচেয়ে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে। জীবন এখানে বড়ই কষ্টকর। আর তাই যদি তুমি মিথ্যে বলে পার পেতে চেষ্টা করো, তাহলে সেটাই হবে তোমার নিঃশেষ হয়ে যাবার কারণ।

স্তেপের রাত শেষ হয়ে আসছে।

প্রাচ্যের পথ-যাত্রায় সংক্ষিপ্ত রাতের অবসান হতে চলেছে।

ইজেমবেত্ স্টেশন।

আমরা পরস্পরকে বিদায় জানালাম। দীর্ঘ পপ্লার গাছের সারির আড়ালে হারিয়ে গেল সে। স্টেশন্-বিল্ডিং-এর গায়ে তার ছায়াটা শুধুমাত্র প্রলম্বিত হোল।

স্নেহার্ত মাতার মত সেই ট্রেন আবার তার চলা শুরু করল।

না, চেষ্টা করেও তুমি আর ঘুমোতে পারবে না।

রূপালী ফিতের মত স্তেপ্ভূমি জানালার ধার দিয়ে বিদ্যুৎ-গতিতে সরে যেতে থাকল। মাঝে মাঝে অনেক দূরে আকাশ-মাটির প্রান্ত সীমায় ইয়ার্ত্তুদের এক একটা তাঁবু।

নীচে উটের সারি। কৌতূহল মেশানো চোখে, মুখ তুলে তারা তাকিয়ে রইল ধাবমান ওয়াগনগুলোর দিকে।

ভোদ্‌কা, ঝড়, বাসমাচ্‌ ও নতুন জীবন

বুয়াম গিরিপথের গভীর থেকে বেরিয়ে আ.ে পামিরস্ত্রয়্-এর মলিন বাস, "পেল-ব্লু-এক্সপ্রেস" এবং পর্বতশিখরের ছায়ার ভারী আস্তরণকে ঝেড়ে ফেলে উজ্জ্বল সূর্যালোকে স্নানসিক্ত হয়ে ওঠে।

ওপরে সূর্য ও নীচে যাত্রীরা উভয়েই দীপ্তিময়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দেড হাজার মিটারের চেয়েও বেশী উঁচুতে একশো আশি কিলোমিটার প্রশস্ত জলের এক বিরাট .হ্রদ তাদের সামনে বিস্তৃত।

আর আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে এইরকমই এক নির্মল আবহাওয়ায় দিনে বুয়াম গিরিপথের গভীর থেকে বেরিয়ে এসেছিল ধনী কিরঘিজ্‌ মানাপ, শাব্‌দান। সেই সময়ে ঐ গিরিপথটা ছিল আরও বেশী নিষ্করুণ, আর হয়ত সেই জন্যই প্রথম দর্শনেই ইসিক-কুল হ্রদটা অনেক বেশী মনোমুগ্ধকর লেগেছিল তার চোখে এবং হয়ত জীবনে সৌন্দর্যের সেই প্রথম ছোঁয়াতেই মানাপ শাব্‌দান ঠিক করে ফেলেছিল যে ঐশ্বর্যের পাহাড গড়ে তুলেই সেই মুহূর্তটাকে উৎসবমুখর করে তুলবে সে। ইসিক-কুল-এর পশ্চিম তটভূমিকে তখনই সে তার নিজস্ব সম্পত্তি বলে ঘোষণা করেছিল আর নির্দেশ দিয়েছিল বুয়াম গিরিপথের প্রান্তমুখে একটা বসতি বানাতে। (যদিও সে সময়ে একজন ক্ষমতাশালী মানাপের পক্ষে ব্যাপারটা মোটেই কোন জটিল ব্যাপার ছিল না।)

এভাবেই ১৯১০ সাল নাগাদ রাইবাচিই'র উদ্ভব ঘটেছিল। আর তখন থেকে বিপ্লব পর্যন্ত দু'টো মাটির কুটীর সবসময় সেখান থেকেই গিয়েছিল। এক এক সময় সেখানে এক একটা ইয়ার্ত্তুদের দল সেখানে গজিয়ে উঠত। উইয়ের ঢিপির মত যেমন গজিয়ে উঠত সেভাবেই রুক্ষ তৃণভূমিতে হারিয়েও যেত।

এখন এই রাইবাচিইতেই রয়েছে দু' হাজার লোকের এক বসতি। এই ছোট্ট নগরটা এতখানিই নিরস ও আকর্ষণবিহীন যে পথ-পরিক্রমাকালে তীর্থযাত্রীরা এখানে এসে পড়লে, এখান থেকে ছাডা পাবার জন্য যেন ছটফট করতে থাকে। হয়ত এখানকার অধিবাসীদের অবস্থাটাও ঐ তীর্থযাত্রীদেরই মত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কিরঘিজ্‌ পথের অধিবাসী, গাড়ীর চালক, কিরঘিজ্‌ হাইওয়ের জন্য দূর থেকে আসা নির্মাণকারীর দল, ইসিক্-কুল এর জাহাজ-চালকদের কাছে রাইবাচিই

হোল এক মরুদ্যান—এক ধূসর ধূলি-আস্তীর্ণ মরুদ্যান, যেখানে নেই কোন বৃক্ষ, নেই কোন সবুজের চিহ্ন, (যদিও লক্ষ লক্ষ ঘনমিটার জলের বিশাল জলাধারের তীরেই এর অবস্থান, তবুও এখানে কোন জল নেই, নেই কোন নদী যাতে করে উদ্যান কিংবা প্রশস্ত পথগুলোকে জলসিঞ্চিত করা যায়।) শুধুই ধূসরতা ও ধূলি, শ্যামলিমার চিহ্নমাত্র নেই—তবুও রাইবাচিই হোল এক মরুদ্যান।

সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে—রাইবাচিই হোল একটা পোতাশ্রয়, আরও বিশেষভাবে বলতে গেলে এ হোল এক পোতাশ্রয়-নগর। ইসিক-কুলের নৌকাগুলোর বৃহত্তম অবতরণ ক্ষেত্রের জন্যই যে কেবলমাত্র রাইবাচিই'র গুরুত্ব রয়েছে, একথা ভাবলে ভুল হবে ; মূলতঃ কিরঘিজ্ অঞ্চলে চলাচলকারী যানবাহনের মূল বন্দর হিসেবেই রাইবাচিই গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর কিরঘিজ্-এর সমস্ত সড়ক ও কিরঘিজের উত্তর-দক্ষিণের সংযোগকারী সমস্ত সড়ক পথের সংযোগস্থল হোল রাইবাচিই। আর এখানেই এর বর্তমান গুরুত্ব ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা। অচিরেই এখানে গড়ে উঠবে হাজার হাজার লোকের এক বিরাট শহর, এই রাইবাচিই হবে সোভিয়েত কিরঘিজের খাদ্যনালী যার মধ্যে দিয়ে পাঠানো হবে জনগণের জন্য খাদ্য ও দেশের সমস্ত কলকারখানার জন্য কাঁচামাল। আর এই বিশালত্ব লাভ করতে অবশ্যই কয়েক শতাব্দীর প্রয়োজন হবে না, খুব শীগ্গীরই এটা ঘটবে।

কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না তা' হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাইবাচিই একটা ধূলি-ধূসরিত ছোট্ট শহরই থেকে যাবে ; আর তরঙ্গায়িত পর্বতমালার বিপদসঙ্কুল গিরিপথে গাড়ী চালিয়ে এসে ক্লান্ত গাড়ী-চালকেরা দূর দিগন্তে এই রাইবাচিই'র ধূলি-ধূসরিত প্রান্ত রেখার দর্শনেই আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠবে।

আমি ঠিক নিশ্চিত করে বলতে পারব না, রাইবাচিতে কোন্টা খরচ হয় বেশী—পেট্রোল না ভোদ্কা। যদি তুমি রাইবাচিই'র কোন ভোজনালয়ে প্রবেশ কর তবে তোমার মনে হবে যে তুমি নিশ্চয়ই কোন বন্দরের পানশালায় ঢুকে পড়েছো। সস্তা তামাকের ধোঁয়ার আবরণ ঢেকে দিয়েছে বৈদ্যুতিক বাতিগুলোকে ; একটা পরিত্যক্ত লোহার পাতের পেছনে একজন অক্ষম সৈনিককে দেখা যাচ্ছে, সে এ্যাকোর্ডিয়ানে জাজ্ ব্যাণ্ডের সুরের অনুকরণ করছে ; অক্লান্ত মদ্যপেরা রিক্ত টেবিলগুলোর ওপর কনুই ঠেকিয়ে ঝুঁকে পড়েছে ; আর তরুণী ও বৃদ্ধা মহিলারা সাদা এপ্রোণ গায়ে চাপিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বোতলে ভোদ্কা নিয়ে এদিক ওদিক করছে। রাইবাচিই'র সমস্ত ভোজনালয়গুলো একই রকমের—সর্বত্র একই পানশালার দৃশ্য। কিন্তু এখানে একটা আইন রয়েছে, যা' পৃথিবীর আর কোথাও

মাল ওঠা-নামার বন্দর সংলগ্ন কোন পানশালাতেই তুমি দেখতে পাবে না ; আর তা' হোল, পানশালার মহিলাদের প্রতি তুমি এতটুকুও বেচাল হ'তে পারবে না। এখানে যারা বসে রয়েছে তাদেরই মত তারাও শ্রমিক ; আর যারা এখানে মদ্ খেতে আসে তারাও এটা কখনও ভোলে না।

এখানে লোকেরা মদ্ খায় একঘেয়েমিকে ভাঙ্‌তে, কারণ এখানে যে একটা স্থানীয় সিনেমা হল আছে, সেই মাটির তৈরী সিনেমা হলে মাত্র পঞ্চাশ জনের বসার ব্যবস্থা আছে আর সেখানেই ঠেসাঠেসি করে বসতে হয় দু'শোরও বেশী লোককে ; তারা মদ্ খায় কারণ তাদের ঘিরে বন্য-দুর্গম পর্বতশ্রেণী ; তারা মদ্ খায় তাদের শরীর ও মনকে স্রেফ চাঙ্গা করতে কারণ হয়ত দুর্গম গিরিপথ ও সংকীর্ণ গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে কোনও রকম দুর্ঘটনা ছাড়াই তারা এই সবেমাত্র তাদের যাত্রা নিষ্পন্ন করেছে।

যারা দূর শহরগুলো থেকে বড় কোন কাজের ধান্দায় এখানে আসে, যারা এখানে অনেক টাকাই কামায়, কিন্তু জীবনের কোন আস্বাদই পায় না, তারাই এখানে বসে বসে মদ্ খায়। এই উঁচু পার্বত্যভূমিতে সংস্কৃতি অত সহজে প্রস্ফুটিত হয় না। এখানের সবকিছুতেই রাইবাচিই'র বন্দর-মানসিকতার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। এখানে যে একটা সিনেমা হল রয়েছে, সেখানে দেখা যায়, উৎসাহী তরুণেরা হাত দিয়ে ডায়নামো ঘোরাচ্ছে ; দেখা যায় প্রক্ষেপক অস্থিরভাবে ছবিগুলোকে পর্দায় ফেলছে আর সেখানে ভীড় করে রয়েছে পানশালা প্রত্যাগত গাড়ী-চালক, মিস্ত্রী, নাবিক আর বন্দর-শ্রমিকদের অন্ততঃ শ' দুয়েকের এক জনতা। এইমাত্র বোধহয় বন্দরের ক্লাবে সিনেমার দ্বিতীয় শো শেষ হয়ে গেল। রাইবাচিই'র দেড়খানা রাস্তায় মাটির কুটীরগুলোর মাঝেই আধুনিক ইউরোপীয় বাড়ীগুলো মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। একটা থিয়েটার ও একটা নতুন ক্লাব শিগ্‌গীরই তৈরী হবে এবং লাইব্রেরী থাকবে একটা নতুন বড় বাড়ীতে। আর সন্ধ্যায় যদি তুমি অন্ধকারাচ্ছন্ন দেওয়াল-গুলোর ধার ঘেঁষে ঘুরে বেড়াও তাহলে শুধুমাত্র পানশালার জানলাগুলো থেকেই আলোর রেখা তোমার চোখে ঠিক্‌রে আসবে না, এটাও তুমি অবশ্যই দেখতে পাবে যে ইস্কুল ও শিশুদের ডেস্‌কগুলোতে এক মুখ দাড়ি নিয়ে কিরঘিজের মানুষেরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছে ইন্‌টারনাল্ কম্বাশ্‌সান্ ইঞ্জিনের তত্ত্ব অথবা বন্দরের চীফ্ এ্যাকাউন্টট্যান্টের কাছে হিসাব শাস্ত্রের পাঠ নিচ্ছে।

রাইবাচিই'র উত্তাল ভোদ্‌কার সমুদ্রে এসব এমন কিছুই নয়, তবুও এখানেও অল্প কিছু ব্যাপার-স্যাপারই তোমাকে বুঝিয়ে দেবে কোন্ দিকে তাদের গতিপথ। এই তো সবেমাত্র বছর তিনেক হোল শহর হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে রাইবাচিই।

আর আগামী তিন বছরের মধ্যে এই রাইবাচিই এমন একটা শহরে পরিণত হবে, যেখানে সেই পাহাড়ী নদী কুংগেই আলা-তাউ, যা' আজ শীর্ণধারায় বয়ে চলেছে শহরের কয়েক কিলোমিটার ওপর দিয়ে, তার প্রত্যন্ত গর্ভ থেকেই উঠে আসবে প্রাচুর্যের পাহাড়। তখন এই যে ভোদ্‌কার ফোয়ারা, তার রাজত্ব আর থাকবে না, তা' নিঃশেষ হয়ে যাবে পাতালের গভীরে।

আর এটা কোন কাল্পনিক ব্যাপার নয়। অনেক সোভিয়েত শহরই, যারা আরও দ্রুত স্তেপের বুকে গজিয়ে উঠেছে এবং আরও বেশী সৌন্দর্য সম্ভারে প্রস্ফুটিত হয়েছে, তাদের সবায়েরই বিকাশের কাহিনী একই রকম।

যদিও এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র গাড়ী-চালক ও ইসিক-কুল-এর নাবিকদের বন্দর-শহর এই রাইবাচিই—একে সবাই মনে রাখে শুধুমাত্র এর ধূলি, ভোদ্‌কা ও ঝড়ের জন্য।

আর যখন ঝড় ওঠে, ইসিক-কুল-এর সৌন্দর্যই যায় বদলে, হয়ে ওঠে এক ভয়াবহ তাণ্ডব। আর এখন সেই কাহিনীই শোনাব। শোনাব খামারকুলভ্‌ ও কোন্‌দ্রিকভের কাহিনী, আর সেই নতুন জীবনের কথা যা' এই বন্য ও কল্পনাময় দেশের বুকে নিটোল সত্যে বিকশিত হতে চলেছে।

২

শুরুটা ঠিক একটা রোমাঞ্চকর কাহিনীর মত :

ইসিক-কুলের নিস্তরঙ্গ জলে সূর্যকরোজ্জ্বল হাস্যচ্ছোল দিন। 'কিরভ'-এর ডেক্‌-এ যাত্রীরা বিছানাপত্তরের হাল্কা বোঝাগুলো বাঁধতে ব্যস্ত, দৃষ্টি তাদের রাইবাচিই'র দিকে। বন্দরের শস্য গুদামের গম্বুজের চূড়া ও ধূসর সিস্টার্ণ ক্রমেই দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হচ্ছে। আর মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তুষারঢাকা পর্বতের পাচিলে ঘেরা সেই হ্রদের ওপর তাদের বিচরণের সমাপ্তি ঘটতে চলেছে (আর সেজন্যই সুপরিচিত কারাকোল-এ আমাকে নিয়ে যাবে যে নৌকা, তার অপেক্ষায় আমাকে বসে থাকতে হচ্ছে।)

হঠাৎ বুয়াম গিরিপথের দিক থেকে হাল্কা বাতাস বইতে শুরু করল। আস্তে আস্তে হ্রদের স্ফটিক-স্বচ্ছ জল তরঙ্গে উত্তাল হয়ে উঠল—ইসিক-কুল হয়ে উঠলো যেন এক সমুদ্র।

'কিরভ' এর ক্যাপ্টেন খুবই চিন্তামগ্ন চোখে তটভূমির দিকে তাকিয়ে রয়েছেন এবং আন্দোলিত নৌকাগুলোর দিকে জাহাজটাকে নিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন।

ছোট ছোট ঢেউগুলো মুহূর্তে ভারী ঢেউতে বদলে গেল। বাতাসে যেন দ্রুত শক্তির আবেশ ঘটল; মনে হোল বাতাসই যেন সব কিছুর নির্ধারক। যখন বন্দর প্রায় নাগালের মধ্যে আর ঠিক তখনই বুয়াম গিরিপথের গর্ভ চিরে ছুটে এলো 'উহলান', ঝাঁপিয়ে পড়ল জাহাজটার ওপর, ছিটকে দিল তাকে জাহাজঘাটা থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে। দূরত্ব আর পুরু ধূলোর আস্তরণে ঢেকে গেল রাইবাচিই।

আর কিছুক্ষণ আগেও মাটির কিবিত্‌কার দেওয়ালের নীচে যে লোকজন, ঘোড়া, কুকুর আর শুয়োরের দল সূর্যস্নান করছিল—সে সবকিছুই রাস্তা থেকে উধাও হয়ে গেল। প্রচণ্ড ঝড় হঠাৎ যেন ঐ প্রাণময় ছোট্ট শহরটার বুক থেকে জীবনের সমস্ত চিহ্নই মুছে দিল। কুটীরগুলো ছাড়িয়ে কয়েক মিটার উঁচুতে মাটির স্তূপ জমে উঠল। অদৃশ্য গাছগাছালি থেকে ঝরে পড়া বাদামের মত দুর্ভেদ্য ধূলো, ঘাস, আবর্জনা বাতাসের বুক চিরে ছুটতে থাকল। একজন লোক রাস্তা পেরোতে গিয়ে ধূলোতে এমনভাবে ঢেকে গেল যে সে যখন বাড়ীর দরজায় পৌঁছল তখন মনে হচ্ছিল সে না বুঝি কত দীর্ঘ পথ-যাত্রাই না সাঙ্গ করে এলো। চারদিকে প্রকম্পিত কুটীরগুলোকে সগর্জনে বিপর্যস্ত করে চললো উহলান, আর রুক্ষ সমুদ্র সেই তর্জন গর্জনকে নিজের কলরোলে ডুবিয়ে দিল। মানুষ ও প্রাণীরা এক অনিশ্চয়তার কম্প অনুভূতির মুখোমুখি এসে দাঁড়াল, যার সঙ্গে সাধারণত ভূকম্পনের অভিজ্ঞতারই মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এভাবেই দু দু'টো দিন কেটে গেল।

তৃতীয়দিনের সন্ধ্যা নাগাদ 'কিরভ' রাইবাচিই'র জাহাজঘাটায় ভিড়ল। ভয়ে ও সাগর পীড়ায় পাণ্ডুর যাত্রীরা ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার বোঝা নিয়ে জাহাজের ডেক ছেড়ে চলে গেল।

আমি ঐ দু'টো দিন কাটিয়েছিলাম ইঞ্জিনিয়ার মাগারসাকের ঘরে। পামি-রস্ত্রয়ে যে রাস্তা তৈরী হচ্ছিল সেই নির্মাণকার্যের দ্বিতীয় অংশের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন মাগারসাক। শীর্ণকায় অথচ দীর্ঘদেহী ইঞ্জিনিয়ারটি ছিলেন বয়সে তরুণ অথচ অভিজ্ঞতায় বৃদ্ধ। তার ঠোঁটে হাসি লেগেই থাকত, আর তা' আমাকে সব সময়েই অস্বস্তিতে রাখত। হয়ত সেটা ছিল তার একান্তই নিজস্ব। তার বাড়ী ছিল সমুদ্রকূলের নেভা নদীর তীরে সেই বিশাল সুন্দর শহর, লেনিনগ্রাদে। আর তাই রাইবাচিইতে সংস্কৃতি ও শহুরে আরামের নিদারুণ অভাব তাকে সইতে হয়েছিল, বলতে গেলে আজকের দিনেও কিরঘিজের এই দূর পরিত্যক্ত কোণে যা' কিছু তাদের পশ্চাদ্‌মুখীনতার পরিচয় বহন করে, তার সব কিছু থেকেই তাকে এক অবর্ণনীয় কষ্ট

সইতে হয়েছিল। অভিযোগ করার ইচ্ছে হয়ত তার মনে এসেও থাকতে পারে, কিন্তু তা' সে করতে পারেনি। তার হৃদয় উপ্‌ছে বইতো আনন্দের ধারা, আর এটা ঠিক সেজন্য নয় যে তাকে অজস্র কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে, বরঞ্চ তা' ছিল সেই মহান নির্মাণকার্যের জন্য এক গভীর ভাবাবেগেরই প্রকাশ। সে নিজের কাজের মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পেত। রাস্তা নির্মাণের যে কাজের ভার তার ওপর দেওয়া হয়েছিল, তাতে সে যথেষ্ট গর্ববোধ করত। এমনকি বিটোফেনের সিম্ফনী তাকে যতটা নাড়া দিতে পারত, সংস্কৃতিগতভাবে তাকে আরো অনেক গভীরভাবে নাড়া দিত এই চিন্তা যে কংক্রিট ছাড়াই কেমন করে সে কংক্রিটের সেতু বানাবে।

"...এবং ঐ যে তোমার নির্মাণকার্যের পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার অংশের কথা বললে, কমরেড ..."

সে আমার ভুল শুধ্‌রে দিল, 'আটত্রিশ'। সে একটু জোরের সংগেই বললো।

আমি হেসে বললাম, মাত্র তিন কিলোমিটার তো!

"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, তিন কিলোমিটার...গাড়ীতে আসতে ওটা কোন ব্যাপারই নয়। কিন্তু ঐ যে তিন কিলোমিটার যদি তুমি নির্মাণ করতে, তাহলে ওটা হয়ে উঠত তোমার জীবনেরই একটা অংশ, ইতিহাসের একটা অংশ, তুমি আর কোনদিনই তা' ভুলতে পারতে না। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে চতুর্দিকে ছিট্‌কানো পাথরের টুকরোগুলোর সংগে লোকজনদের লড়াই করতে হয়েছিল, কিভাবে উল্টে গিয়েছিল মালবাহী ঠেলাগাড়ীগুলো, কিভাবে ট্র্যাক্টরটার অন্তিম ঘনিয়ে এসেছিল...না, না, শুধু আমার কথামত ঐ তিন কিলোমিটারকে নিও না, ওগুলো হোল জীবনের এমন এক খণ্ডাংশ যার জন্য একজনকে কখনও গর্ব বৈ লজ্জা পেতে হয় না ..."।

এরকমই মানুষই ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মাগারসাক।

উহলানের ঐ দু'টো দিনই আমাকে ছোট্ট ঘরটাতেই কাটাতে হোল। মাত্র এক বছর হোল ঐ ঘরটা রাইবাচিই'র মিলিশিয়ার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। ঝড় বাইরের চত্বরে সগর্জনে আছড়ে পড়ল। ইট-পাথরের টুকরোগুলো জানলায় ও ভাঙ্গা খড়খড়িতে লাগানো কার্ডবোর্ডগুলোর ওপর আছড়ে পড়ল। চীফ ইঞ্জিনিয়ার কমরেড পোপোভ্‌ আবার দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক ঐ উহলানের সময়েই রাইবাচিইতে এসে হাজির হলেন, তাকে তাই পা গুটিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে বিছানাতেই শুয়ে থাকতে হোল। তামাক ভরবার জন্য খবরের কাগজের ফালিগুলোকে পাকিয়ে সিগারেটের খোল বানাতে থাকল পামিরস্ত্রয়ের এক তরুণ টেকনিশিয়ান নিকোলাই ইভানোভিচ্‌ (কেউই চলে গেল না, আমরা কেউই ঐ বিশ্রী আবহাওয়ায় বাইরে যেতে চাইলাম না।) ইঞ্জিনিয়ার মাগারসাক চেঁচিয়ে এটাই বলতে চাইলেন যে তিনি বুঝতে

পারছেন না ধূমপানের দিক দিয়ে 'ইজ্‌ভেস্তিয়া' র চেয়ে 'সোভিয়েত কিরঘিজ্‌' কেন বেশী সুস্বাদু; তবে যেহেতু তিনি তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে কোন তামাসার আশ্রয় নিচ্ছেন না, তাই আমাদের কোন প্রতিক্রিয়াও হোল না। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম পোপোভের গাড়ীচালক ভিক্‌টর আন্দ্রেয়েভ্‌। তার চেহারায় রয়েছে শিশুসুলভ সারল্য ও তার রয়েছে একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। অক্লান্তভাবে সে কর্কশ সুরের বিরক্তিকর কতকগুলো রেকর্ড বাজিয়ে চলল। গ্রামোফোনটা এক প্রতিবেশীনীর। গ্রামোফোন মালিক আনা বারিসোভা একজন ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর নিজের কাজ ছাড়াও পামিরস্ত্রয়ের গাড়ীচালক ও কেরানীদের তিনি আবার রাস্তা নির্মাণের পাঠও দিয়ে থাকেন। উহলান তার ঐ পাঠদানে কোন ব্যাঘাতই ঘটাতে পারল না। এখান ছেড়ে যাবার আগে তিনি আমাদের কাছে এই প্রতিশ্রুতিই আদায় করে নিয়েছেন যে আমরা যেন ওটাতে বেশী দম না দিই, কারণ তাঁর কথায়, "তোমরা নিশ্চয়ই বুঝবে যে আমরা এখানে সংস্কৃতির এই অবশেষটুকুকে হারাবার ঝুঁকি নিতে পারিনা।"

আমরা বসে রইলাম আর গ্রামোফোনে 'নিওপোলিটান তারান্তেল্লা'র লেবেল আঁটা রেকর্ডে বেজে চলল 'লাফিং গার্ল' এর সুর। আর ঐ যে টেকনিশিয়ানটি এতক্ষণ তামাক বিহীন সিগারেটের খালি খোলাগুলো হাতে নিয়ে চুপচাপ বসেছিল, হঠাৎ বলে উঠল—"আচ্ছা আমরা যদি তাঁর স্মরণে 'ডেথ্‌স কর্ণার'এ একটা স্মৃতিস্তম্ভ গড়ি।"

গাড়ীচালকটি মাথা নাড়ল, ইঞ্জিনিয়ার পোপোভ্‌ একবার চোখ তুলে তাকালো আবার পরক্ষণেই নামিয়ে নিল, মাগারসাক টেবিলক্লথের ওপর নখের আঁচড়ে একটা সরীসৃপের ছবি খোদাই করতে থাকল, ক্রমেই ফুটে উঠল একটা মাঝারি বক্ররেখা। এটাই আমি বুঝতে পারলাম যে নিস্তব্ধতার গভীরে শুধু একটা স্বপ্নই বুনতে থাকল যা' তাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে, আর তা' হোল সেই রাস্তার স্বপ্ন যা' তারা তৈরী করতে ব্যস্ত। আর এটা বুঝতে আমার অসুবিধে হোল না যে, যদি তারা সেই স্বপ্নের কথা উচ্চকণ্ঠে বলত তবে তারা বোধহয় তাদের কর্ম ও বীরত্বের এক জীবন্ত উপন্যাস সৃষ্টি করে ফেলত।

আমি তাদের নীরবতাকে ভাঙ্‌তে চাইনি। কিন্তু এসত্ত্বেও সম্ভবতঃ আমার চোখ ও হাতের পটভূমিতে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই পরিপূর্ণতায় ফুটে উঠল যে নিকোলাই ইভানোভিচ্‌ যেন তার উত্তরেই বলে উঠল—'ইলিয়াসভের উদ্দেশ্যে'।

ইলিয়াসভ্‌ ছিলেন একজন বৃদ্ধ টেকনিশিয়ান। গোড়া থেকেই তিনি পামিরস্ত্রয়ে কাজ করছিলেন। পামিরস্ত্রয় গড়ে ওঠার আগে থেকেই তিনি পামিরের

গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন, যে পামীর থেকেই জায়গাটার নামের উদ্ভব ঘটেছিল। ঐ নির্মাণকার্য শেষ হবার দু'বছর আগেই পামিরের উচ্চভূমি ছেড়ে কিরঘিজ্ প্রজাতন্ত্রের কুংগেই ও তার্সকেই আল্-তাউ-এর উচ্চভূমিতে আরোহণ করতে শুরু করলেন। ১৯৩১ সাল শেষ হবার আগেই গ্রেট কিরঘিজ্ হাইওয়ের প্রস্তাবিত পথের ওপর গবেষণার প্রধান রূপরেখা তৈরীর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। একটা লরীতে চেপে তিনি অভিযানের পথে রাইবাচিই থেকে ফ্রন্‌জ যাচ্ছিলেন। সেটা ছিল খুবই মজার পথ-যাত্রা, কারণ গবেষণার সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোই সমাধা করা হয়ে গিয়েছিল, কোনরকম দুর্ঘটনা ছাড়াই কঠিন কাজটা সারা হয়ে গিয়েছিল। পেটমোটা ব্রিফ্‌কেস্‌টা ভর্তি ছিল অংকন ও গণনা ভর্তি নানা কাগজপত্রে, যা প্রস্তাবিত নতুন রাস্তাটা নির্মাণের জন্য ছিল একান্তই অপরিহার্য। কুড়িজন তরুণ ছিল সেই লরীতে। মনের স্ফূর্তিতে তারা ছিল উচ্ছ্বল আর তাদের বৃদ্ধ নেতাকে শ্রদ্ধা ও উৎসাহের সঙ্গে বসিয়েছিল গাড়ীচালকের ঠিক পাশের আসনটাতে এবং গাড়ীও ছেড়ে দিয়েছিল যথারীতি।

সেই সময়ে বুয়াম গিরিপথের মধ্যে দিয়ে যাতায়াতে বিপজ্জনক ঝুঁকি নিতে হোত। কাঁচা মাটির রাস্তা সবসময় ভিজে থাকত বৃষ্টি ও তুষারে, আর প্রতিমুহূর্তেই গাড়ী পিছ্‌লে যেতে চাইত চু নদীর গর্ভে। তারা গিয়ে পৌঁছলো ডেথ্‌স কর্ণার-এ। ঐ সর্পিল পথে গাড়ীচালক অতি সন্তর্পণে একটা বাঁক নিল, যাত্রীরাও আর একবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তারা পেছনে ফেলে এলো ডেথ্‌স কর্ণারকে।

কিন্তু মৃত্যু তাদের সঙ্গ ছাড়ল না তাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো সে। গাড়ীর পেছনের চাকায় তার নোংরা ও পিচ্ছিল হাতের ছোঁয়া লাগল।

গাড়ীটা পড়তে থাকল। যাত্রীদের বাইরে ছিট্‌কে দিল। তাদের ক্ষতবিক্ষত মুখগুলো থেকে রক্ত মুছতে মুছতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তারা নেমে এলো সেই নদীর তীরে যেখানে গাড়ীটা তার অন্তিম যাত্রা শেষ করে এসে থেমেছে।

গাড়ীচালক ও বৃদ্ধ টেকনিশিয়ান ইলিয়াসভ্ কেবিনেই বসে রয়েছেন। তবে তারা আর বেঁচে নেই।

"দি গ্রেট কিরঘিজ্ হাইওয়ের তারাই ছিল প্রথম শিকার।"

"এবং আরও মৃত্যু ঘটেছিল নিশ্চয়ই!"

"না, আর ঘটেনি, ওটাই শুধুমাত্র।" শুধুমাত্র শুরুটাই এত খারাপভাবে হোল। অত্যন্ত খারাপ অবস্থার মধ্যে দু'বছর ধরে যে নির্মাণকার্য চলেছে, তাতে আর একবার এধরণের একটা ঘটনা ঘটেছিল, যাতে কাজ করতে গিয়ে আমাদেরই

একজনকে জীবন দিতে হয়েছিল। দুর্ঘটনা বশতঃ পাহাড়ের একটা দেওয়াল ধ্বসে একজন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছিল। এই ঘটনায় এক বিরাট শিক্ষামূলক প্রচার অভিযান চালানো হয়—এবং আমাদের রাস্তায় আর কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি…"

আমরা আবার সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেলাম। আনা বারিসোভা ফিরে এলেন। আমরা ছ'জনে নিশ্চুপই রইলাম।

ঐ টেকনিশিয়ানটিই আবার শুরু করল—

"ইলিয়াসভের ছিল মাথাভর্তি সাদা চুল। ওগুলো এক দিনেই সাদা হয়ে গিয়েছিল। পামীরেই সাদা হয়ে গিয়েছিল…সাদা হয়ে গিয়েছিল চিচিরচিক গিরিপথে…দস্যুরা আমাদের ধরে ফেলেছিল …।"

৩

মধ্য রাশিয়ায় কলকারখানাগুলোর কাঁচামালের উৎসই ছিল মধ্য এশিয়া—এর আর অন্য কোন পরিচয় জানা ছিল না। মধ্য এশিয়া ছিল অজ্ঞাত, পশ্চাদ্‌পদ জারের এক উপনিবেশ, যেখানে কলকারখানা বলতে কিছুই ছিল না (জারের সরকার তুর্কেস্তানে কলকারখানা খোলার বিরুদ্ধে ফরমান জারী করেছিল, যাতে করে ইভানোভোজনেসেস্ক-এর কারখানা মালিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে না পড়তে হয়) আর শিল্প-শ্রমিক বলতে যা' বোঝায় এ অঞ্চলে তাদের সংখ্যা বোধহয় হাতে গোণা যেত (কারণ রুশ উপনিবেশবাদীরা তাদের কলকারখানার উজবেক অথবা কিরঘিজ্, তুর্কমেন অথবা তাজিক্, এদের কাউকেই নিয়োগ করত না—কেবলমাত্র রুশ শ্রমিকদেরই নিয়োগ করত।) এই বিশাল অঞ্চলটা জুড়ে প্রচলিত ছিল আদিম কৃষিব্যবস্থা, আধা-সামন্ততন্ত্র, আর বলতে গেলে শতকরা একশো ভাগ নিরক্ষরতা। এটা ছিল এমন একটা অঞ্চল যেখানে মোল্লারাই ছিল ধর্ম আর আল্লার একমাত্র সত্যিকারের প্রতিনিধি এবং তাদের তৈরী করা আইন ও নির্দেশনামাকে লঙ্ঘন করার দুঃসাহস গরীব দেখান্ ও বাত্রাক্‌দের কখনও হোত না।

পশ্চাদ্‌মুখীনতা ও বিচ্ছিন্নতা ছিল প্রতিবিপ্লবের সবচেয়ে বড সহায়ক। বাকী সামন্তবাদীরা ও সদ্যপ্রসূত স্থানীয় বুর্জোয়ারা ঔপনিবেশিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে এক যৌথ মোর্চা গড়ে ফেলল আর মোল্লাদের প্রচারকার্যের জোরে জনগণের মনে বিষ ছড়িয়ে দেবার কাজে এগিয়ে এলো। সমস্ত কিসলাক্-এর অধিবাসীরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল, যারা ছিল সবচেয়ে গরীব তাদেরই শ্রেণী-শত্রুদের হাত থেকে তারাও অস্ত্র তুলে নিল এবং সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামিল হোল। মুসলমান ধর্মবেত্তাদের কাছ থেকে তারা এটাই বুঝলো যে সোভিয়েত সরকার নাকি

গরীবদের সব সম্পত্তি এমন কি তাদের উটগুলো ও নারীদেরও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে চায় এবং আল্লার কাছে প্রার্থনা করা থেকেও তাদের বিরত করতে চায়।

ফলে, সোভিয়েত অন্য যে কোন জায়গার তুলনায় মধ্য এশিয়ায় গৃহযুদ্ধ অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। সোভিয়েত সরকারের প্রকৃত পরিচয়ের খবর খুবই ধীরে ধীরে তান্‌সান্‌ ও পামিরের উপত্যকায় পৌঁছেছিল।

মধ্য এশিয়ায় গৃহযুদ্ধ ১৯২৬ সাল পর্যন্ত চলেছিল। শেষ পর্যন্ত যে সব শ্রমিক প্রকৃত সত্যটা বুঝতে পারলো, তারা নিজেরাই প্রতি-বিপ্লবের নেতাদের লালফৌজের হাতে তুলে দিল। আর যুদ্ধে পরাজিত বিপর্যস্ত হয়ে বাসমাচ্‌ নেতারা পালিয়ে গেল আফগানিস্তান, পারস্য ও ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে। ওসব অঞ্চলের ব্রিটিশ উপদেষ্টারা ঐ দস্যুদের প্রতিবিপ্লবী তৎপরতার মধ্যে সরকারী স্বার্থের অভিন্নতা খুঁজে পেল, আর তাই নিজেদের ছত্রচ্ছায়ায় তাদের আশ্রয় দিল।

সেই বাসমাচ্‌রা চলে গেল আর পেছনে রেখে গেল তাদের অত্যাচার ও অপরাধের এই অসহনীয় বোঝা। চারিদিকে ছড়ানো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত শত শত কিস্‌লাক, লণ্ডভণ্ড কৃষিব্যবস্থা, জেলাগুলোতে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত সেচ ব্যবস্থা; তাছাড়া দারিদ্র্য, বুভুক্ষা, হাজার হাজার বিধবা নারী ও অনাথ শিশু এবং বিকলাঙ্গ ও পঙ্গু অজস্র যোদ্ধা যারা সোভিয়েত ভূমির জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে উন্মাদ বাসমাচ্‌দের হাতে বন্দী হয়েছিল। "শারিয়াত্‌-এর প্রতি যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল" বাসমাচ্‌রা তাদের নাক, কান, আঙুল, এমন কি হাত পর্যন্ত কেটে নিয়েছিল।

বল্‌শেভিকদের নেতৃত্বে মধ্য এশিয়ায় আবার নতুন করে গড়ার কাজ শুরু হোল। বাসমাচ্‌রা যা' কিছু ধ্বংস করে রেখে গিয়েছিল সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকেই গড়ে উঠতে থাকল এক নতুন মধ্য এশিয়া। মধ্য এশিয়া তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে প্রস্ফুটিত হতে থাকল।

প্রথম পাঁচ-সালা পরিকল্পনা এলো। সমাজতন্ত্রের মূল বনিয়াদ গড়ার জন্য সেই পরিকল্পনার বাস্তবতা সবাই বুঝতে পারল। তবে পাঠকদের অবশ্যই একথা মনে রাখতে হবে যে সেই সময়েই সোভিয়েত-এর সমস্ত শত্রুরা আবার অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়া যুদ্ধ বাধাবার ফিকির খুঁজ্‌তে লাগল, পোপ্‌ সোভিয়েত-এর বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের ডাক দিলেন, বুর্জোয়া সাংবাদিকরা অশ্রুতপূর্ব মিথ্যার পাহাড় গড়তে লেখনী ধরল, সোভিয়েত-এর বিরুদ্ধে সবকিছুকে চাগিয়ে তোলার কাজ পুরোদমে চলতে থাকল এবং বাসমাচ্‌রা ছুটে এলো আফগানিস্তান থেকে ও দ্বিতীয়বারের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রের ওপর। যুদ্ধের

জন্য পুঁজিপতিদের আকাঙ্ক্ষা, পোপের আহ্বান, সাংবাদিকদের প্রচার ও দস্যুদের আক্রমণ—সবকিছুই দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল। পুঁজিবাদী দুনিয়া এটা খুব ভালভাবেই বুঝে গিয়েছিল যে যদি তারা পাঁচ-সালা পরিকল্পনার পূর্ণায়নকে বিপর্যস্ত করতে ব্যর্থ হয় তবে প্রথম শ্রমিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য তাদের সব আশাতেই চিরকালের জন্য পূর্ণচ্ছেদ পড়বে।

বাসমাচ্‌দের অস্ত্রে-শস্ত্রে বেশ ভালভাবেই সজ্জিত করা হয়েছিল। তাছাড়া তাদের চালাবার জন্য ছিল ভালরকম শিক্ষাপ্রাপ্ত সব সেনাপতিরা। বিশেষতঃ তাদের সাফল্যের জন্য ইংলণ্ড সযত্নেই তাদের সবরকম সাহায্য যুগিয়েছিল, কারণ মধ্য এশিয়ায় প্রজাতন্ত্রের সম্পদের লালসা ইংলণ্ড তখনও ছাডতে পারেনি। তাছাড়া ইংলণ্ডের অন্য ভয়ও ছিল—তাদের ভারত ও অদূরবর্তী ঐসব অঞ্চলের মধ্যে ছিল শৈলশিরার মাত্র এক সংকীর্ণ ব্যবধান, যার ওধারে অদূর ভবিষ্যতে সমাজ-তন্ত্রের উত্থান তাদের কাছে এক বিপজ্জনক উদাহরণ হয়ে উঠতে পারত।

বাসমাচ্‌দের ছিল ইংরেজদের তৈরী রাইফেল, মেশিনগান, আর তাদের ছিল ইংরেজ প্রশিক্ষক। কিন্তু গৃহযুদ্ধে তাদের সবচেয়ে বড় যে সহায়টা আগে ছিল, সেটা আর তাদের রইল না। জনগণের অনগ্রসরতা ও অজ্ঞতার দরুণ যে জনসমর্থন আগে তাদের পেছনে ছিল, সেটা আব তাদের রইল না। সোভিয়েতের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে পা বাডাবার অনেক আগেই মধ্য এশিয়ার অধিবাসীরা এটা বুঝে ফেলেছিল যে বাসমাচ্‌রাই তাদের সবচেয়ে বড শত্রু।

প্রথম পাঁচ-সালা পরিকল্পনাকালে বাসমাচ্‌রা যে হঠকারী অভিযান চালিয়ে-ছিল তাকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করা হয়েছিল; কিন্তু এসত্ত্বেও সেই সময়েও অনেককেই তাদের সশস্ত্র নৃশংসতার শিকার হ'তে হোল।

১৯৩১ সালেব জুলাই মাস। চিহিরচিক গিরিপথে কাজ করছিল একদল সোভিয়েত টেকনিশিয়ান। পামিব-এ প্রথম রাস্তা, পৃথিবীর সর্বোচ্চ রাস্তা নির্মাণের জন্য গবেষণার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তারা। তাদের বেশীরভাগই বয়সে তরুণ, শুধুমাত্র ব্যতিক্রম তাদের নেতা, যাকে তারা 'বৃদ্ধ ইলিয়াসভ্‌' বলে ডাকত।

দিনটা ছিল ঝলমলে।

ঘোডার পিঠে চেপে একদল লোক আসছিল গিরিপথের দিকে। যারা ঐ গিরিপথের শীর্ষে কাজ করছিল তারাই প্রথম তাদেরকে দেখতে পেল।

অশ্বারোহীদের কাঁধে ঝোলানো রাইফেলগুলো থেকে ঠিকরে আসছিল আলো। তারা চিৎকার করে উঠল, 'বাসমাচের দল'!

টেকনিশিয়ানরা পাহাড়ের এদিকে ওদিকে ও নীচের ঢাল বেয়ে ছড়িয়ে

পড়ল। দ্রুত তাদের তাঁবুতে ফিরে গেল তারা, বাঁচাতে চাইল পরিকল্পনার নক্সা ও কাগজপত্রগুলোকে ; কিন্তু ঐ অশ্বারোহীরা এগিয়ে আসছিল তাদের চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে।

গোটা দলের দু'জন মাত্র পাহাড়ে গা ঢাকা দিতে পারল, আর বাকীরা সবাই ধরা পড়ল বাসমাচ্‌দের হাতে।

আর গোটা ব্যাপারটাই ঘটে গেল মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে। তাঁবু থেকে এমন অনেক কিছুই খোয়া গেল যা' বাসমাচ্‌দের কাছে কোনও না কোন কারণে মূল্যবান বলে মনে হোল। কাগজপত্র, নক্সা, গাণিতিক হিসেব-নিকেশের সব কিছুই ছত্রাকার হয়ে গেল। বলতে গেলে বন্দীদের সবাইকেই প্রায় নগ্ন করে ফেলা হোল আর ঐ অশ্বারোহীদের বেষ্টনীর মধ্যে রেখে তাদেরকে তারা ঠেলে নিয়ে চলল কোন্ এক অজ্ঞাত স্থানে। হিমবাহগুলো থেকে সূর্যের আলো ছিট্‌কে আসতে থাকল আর বন্দীদের নগ্ন চামড়াগুলোকে পুড়িয়ে দিতে থাকল। আর যখন সূর্য গেল অস্তাচলে তখন তাদের চামড়ার ওপর কামড় বসাল তুষারের তীক্ষ্ণ দংশন। তাদের খেয়ালই রইল না যে তারা কতক্ষণ হেঁটে চলেছে, আর বুঝতেও পারল না কোথায়ই বা চলেছে তারা। গিরিপথের এক জায়গায় এসে থামল তারা। কনকনে হিমেল বাতাস তাদের দেহগুলোতে চাবুক চালাতে থাকল। আর সেখানেই বাসমাচ্‌দের দলনেতার তাঁবু।

কেবলমাত্র একটা প্রশ্নই ঐ দলনেতার করার ছিল : "কে তোমাদের নেতা ?"

বৃদ্ধ ইলিয়াসভ্ ছাড়া আর বাকীরা সবাই ছিল কোমসোমোলের সদস্য। তারা স্বাভাবিকভাবেই সব কষ্টই সহ্য করল। কেউই তাদের নেতার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করল না, যার ফল হোত তার নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড। তাদের সবাইকেই মারধোর করা হোল, ছুরি, রিভলভার ও তরবারি নিয়ে ভয় দেখানো হোল। কিন্তু বন্দীরা সবাই একযোগে এটাই বোঝাল যে, যে দু'জন পালিয়ে গেছে তারাই তাদের নেতা ও সহকারী নেতা এবং তারা নিজেরা হোল সাধারণ লোকজন।

দলনেতা একজন অশ্বারোহীকে প্রধান তাঁবুতে পাঠালেন খবরটা পৌঁছে দেবার জন্য।

আর ঐটুকুই তাদের কাছে নিয়ে এলো আশা করার মত অনেক কিছুই। কারণ তার মানে হোল, যে তারা আরো কয়েক ঘণ্টা সময় পাবে, আর তার মধ্যেই হয়ত এসে পৌঁছবে সাহায্য, এসে পৌঁছবে লালফৌজের লোকজনেরা।

কিন্তু বেশীক্ষণ আর তারা সেই আশায় সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে পারল না। একজন বাসমাচ্ আবিষ্কার করে বসল যে ঐ বন্দীদের মধ্যে একটি মেয়ে রয়েছে।

মেয়েটির চুল ছিল ছোট করে ছাঁটা আর তার পরনের ট্রাউজারটা ছিল ছেলেদেরই মত। বাসমাচ্‌রা যখন তাদের জামা-কাপড়ের ওপর লুঠতরাজ চালিয়েছিল তখন সৌভাগ্যক্রমে ধকলটা মেয়েটির ওপর দিয়ে গিয়েছিল সবচেয়ে কম। দস্যুদলটা তখনও পর্যন্ত লুঠের মালটিকে ঠিক চিনতে পারেনি আর বন্দিনীটির দিক দিয়ে এটা ছিল একটা রীতিমত সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর, এখন সেই সৌভাগ্যেরই অন্তিম ঘনিয়ে এলো। মেয়েটিকে তারা চিনতে পারল।

খবরটা খুব দ্রুতই ক্যাম্পের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এবং দেখতে না দেখতে চারদিক থেকে দস্যুরা ছুটে এলো। কোমসোমোল যুবকরা তাদের কমরেডকে কিছুতেই ছাড়তে চাইল-না। একটা অসম যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। অতি দ্রুতই বন্দীরা পর্যুদস্ত হোল আর ক্রুদ্ধ বাসমাচ্‌রা ঐ বন্দিনীর কথা ভুলে গিয়ে টেকনিশিয়ানদের গোটা দলটাকেই ঠেলে বাইরে পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেল। টহলদারির সময় পাহাড়ের ঐ দিকটায় লালফৌজের প্রায়ই চোখে পড়ত সোভিয়েত শিক্ষক, ইয়াশ্‌মাক্ পরিত্যাগকারী উজ্‌বেক মহিলা, যৌথ খামারের চাষী আর কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীদের মৃতদেহ।

বন্দীরা জানত তাদের জন্য কি অপেক্ষা করে আছে। মৃদু পদক্ষেপে পাহাড়ের ধারে কয়েক পা এগোবার ফাঁকেই তারা পরস্পরের হাত শেষ বারের মত চেপে ধরেছিল। নিখুঁত শিকারীর মত বাসমাচ্‌দের রাইফেলগুলো তাদের দিকে তাক করে রইল।

কিন্তু একটা গুলিও তারা ছুঁড়তে পারল না।

রাইফেলধারী বাসমাচ্‌দের মধ্যে একজন অশ্বারোহী এসে হাজির হোল। বন্দীদের কানে এলো কিছু অবোধ্য কথাবার্তা। আর তখনই বাসমাচ্‌রা তাদেরকে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে নীচে নামিয়ে নিয়ে যেতে থাকল এবং তারা ঠিক বুঝতে পারল না যে জীবন থেকে মৃত্যুকে পৃথক করে রেখেছিল যে মুহূর্তটা সেটা কেটে গেছে কিনা অথবা তখনও তারা ঠিক বেঁচে আছে কিনা।

গিরিপথ, পাহাড়ের মধ্যবর্তী খাদ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বন্দীদের টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আর বাসমাচ্‌দের সম্ভ্রমপূর্ণ হাবভাব ও কথাবার্তা থেকে তারা অনুমান করল যে তাদের গন্তব্যস্থল হোল হেড্‌কোয়ার্টার। এখন তাদের ভাগ্যে কি ঘটতে চলেছে এই নিয়ে তাদের আর কোন মাথা ব্যথা রইল না। হেড্‌কোয়ার্টারের তাঁবুতে দেখা মিলল একজন ইংরেজ ইনস্ট্রাক্টরের আর তারা এটা জানত যে ইংরেজটি সেইসব লোকজনদের বিষয়ে স্বাভাবিক কারণেই আগ্রহী হবেন যারা হিন্দুস্থানের দোর গোড়ায় পামিরে ভবিষ্যতের জন্য রাস্তা তৈরী করছে।

একথা ভেবেই তারা দুঃখ বোধ করতে থাকল যে কেন আর কয়েক সেকেণ্ড পরে সেই অশ্বারোহীটি খবরটা পৌঁছে দিল না। এখন তাদের জন্য যে মৃত্যু অপেক্ষা করে রইল রাইফেলের গুলিতে শান্তভাবে মরার চেয়ে অবশ্যই তা' আরো কষ্টকর।

গিরিপথের মধ্যে দিয়ে তাদের ক্লান্তিকর যাত্রার দুঃখময় চিন্তা-ভাবনাগুলো মেশিনগানের গুলির শব্দে মাঝে মাঝেই বিক্ষত হচ্ছিল। বাসমাচ্‌দের কনভয়গুলোর সামনে দিয়েই মাটির টুকরোগুলো উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ এসে পড়া শক্রর মুখোমুখি হোল দস্যুরা। মাত্র কয়েক মিনিটই গোলাগুলি চলল। লালফৌজের যে দলটি এখানে বন্দীদের কনভয়ের প্রতীক্ষায় ছিল, তারা ছিল অনেক বেশী শক্তিশালী ...।

পরবর্তী যাত্রাপথটা ছিল আনন্দ আর খুশীতে ভরা। বন্দীরা গেল বাসমাচ্‌দের জায়গায় আর বাসমাচেরা এলো বন্দীদের জায়গায়।

আর চিহিরচিকের নীচে তারা যখন ঘাঁটিতে এসে পৌঁছল তখনই শুধুমাত্র তারা লক্ষ্য করল যে 'বৃদ্ধ' ইলিয়াসভের কালো চুলগুলো পুরোপুরি সাদা হয়ে গেছে।

পামিরের রাস্তা তৈরী শেষ হোল। আর উত্তর-বাদাখ্‌সানের যে অঞ্চলটা মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসে বিচ্ছিন্ন, দুর্ভেদ্য বলে পরিচিত ছিল, সেটাই আজ পৃথিবীর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে একটা পরিচ্ছন্ন সড়কের মাধ্যমে যে সড়ক বরাবর গাড়ী চালিয়ে পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিপথে পৌঁছন যায়। যে যাত্রায় আগে সপ্তাহের পর সপ্তাহ লেগে যেত, আজ সেই পথই যাওয়া যায় মাত্র কয়েক ঘণ্টায়।

আর সেই অভিজ্ঞ পামিরসড়কের নির্মাণকারীরা, যারা সেদিন ছাড়া পেয়েছিল বাসমাচ্‌দের বন্দীদশা থেকে, তারাই আজ কিরঘিজ্‌ প্রজাতন্ত্রের উঁচু পাহাড়গুলোর ওপর দিকে তৈরী করছে গাড়ী চলাচলের রাস্তা।

ইঞ্জিনিয়ার মাগারসাক্‌ বললেন, "জান, এই গ্রেট কিরঘিজ্‌ হাইওয়েতে এখনও বাসমাচেরা রয়েছে?"

"কোথায়?"

"বেশী দূরে নয়—এই বুয়াম গিরিপথে।"

আমি এটাই ভেবেছিলাম যে বাসমাচ্‌দের দলগুলো ভেঙ্গে যাওয়ার পরও কিছু লোক বেঁচে থাকতে পারে এবং থাকলে, ঐ এককালের বিপজ্জনক শত্রুরা নিশ্চিতভাবেই দুর্গম পাহাড় চূড়ায়, তান্‌সান্‌ পর্বতের জনশূন্য পরিত্যক্ত শুষ্ক নদীর খাতেই বসবাস করছে, কারণ একমাত্র ঐসব জায়গাতেই তারা আশ্রয় পেতে পারে। কিন্তু বুয়াম গিরিপথ—সেখানে তো প্রাণ-প্রাচুর্যের ছড়াছড়ি। যেখানে

প্রতিদিন যাতায়াত করছে শত শত গাড়ী, কাজ করছে শত শত লোক, সেখানে বাসমাচেরা আসতে পারে কি করে ?

কিন্তু পরে আমি সেখানেই তাদের দেখা পেয়েছিলাম। আর তা' ছিল এক আনন্দময় যোগাযোগ।

বুয়াম গিরিপথের রাস্তা তৈরীর কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। শুধুমাত্র জায়গায় জায়গায় শ্রমিকদের দল রাস্তাটাকে চওড়া করছে, অথবা নিরাপত্তার স্বার্থে অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে ঝুলে থাকা শিলাস্তূপের ওপর কংক্রিটের প্যারাপেট্ তৈরী করছে। তারা কাজ করছে খুবই দ্রুত আর কাজ করছে উচ্ছ্বসিত উৎসাহে।

"আমরা কথা দিয়েছিলাম, বিপ্লব-বার্ষিকীতে, সাত তারিখের মধ্যেই রাস্তাটার নির্মাণকার্য শেষ করব এবং সম্মানের খাতিরে ঐ সময়ের মধ্যে আমাদের এটা করতেই হবে ...।"

.. এটা ইঞ্জিনিয়ার মাগারসাক্ বা নির্মাণকার্যের প্রধানের কথাই ছিল না। খামারকুলভ্‌ও এই কথাই বলেছিল। খামারকুলভ্ ছিল একজন পুরোনো দিনের কুলাক্। তার গোটা ব্রিগেড্‌টাই ছিল প্রাক্তন কুলাক্‌দের নিয়ে গড়া। আর নির্মাণকার্যে ঠিক এই ব্রিগেড্‌টার পরেই ছিল যে ব্রিগেড্‌টার স্থান, সেটা ছিল এক-কালের চোর-ছ্যাঁচোড়দের নিয়ে গড়া। সেই ব্রিগেডের নেতা কোন্দ্রিয়াকভ্ ছিল এককালে মধ্য-এশিয়ার শহরগুলোর এক ভীতিপ্রদ অতিথি। আর এই কোন্দ্রিয়াকভ্-এর ব্রিগেড্‌টার নীচে কাজ করছে যে ব্রিগেড্‌টা, সেটা কিরঘিজের বাসমাচ্‌দের নিয়ে গড়া।

১৯৩৫-এ বুয়াম গিরিপথে বাসমাচ্‌দের সঙ্গে আমার দেখা হোল, আর তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি আনন্দই পেলাম। আমার আনন্দ হোল এজন্য নয় যে তারা আর ক্ষতিকর নয় অথবা প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিজয়ে ও তাদের মধ্যে শুভ প্রয়াসের উদ্বোধনে বিপ্লবের শক্তিরই প্রকাশ ঘটছে ; বরঞ্চ এজন্য যে প্রলেতারীয় বিপ্লব এক অমিতশক্তির আধার হিসেবে এদেরকে পাল্টে দিতে পেরেছে, নির্মাণ-কার্যের নতুন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে এই পুরোনো শত্রুদের কাজে লাগাতে পেরেছে, তাদের জীবনধারাকে একেবারে গোড়া থেকে পাল্টে দিতে পেরেছে ; আর মূলতঃ এই কারণেই আমি আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলাম।

বাসমাচেরা স্বেচ্ছায় এখানে কাজ করতে আসেনি। কৃতকর্মের ফল হিসেবে দণ্ডভোগ করতেই তাদের এখানে পাঠানো হয়েছিল। তাই তাদের কাজ করায় অনিচ্ছা ও পালাবার ইচ্ছার ওপর নজর রাখার জন্য গোড়ার দিকে রাইফেলধারী রক্ষীও নিয়োগ করতে হয়েছিল।

আর এখন ইসিপ্লাসেভ্ নিজেই সামরিক বাহিনীর রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে নবাগত বাসমাচ্‌দের তদারক করছে যা'তে তারা পালাতে না পারে। কিন্তু তাকে কখনই রাইফেলটা ব্যবহার করতে হয়নি, আর কখনও ব্যবহার করতেও হবে না; কারণ, সে আগেকার 'ওগাপু'র রক্ষীদের কাছ থেকে সুরক্ষার অন্য এক পদ্ধতির কথা জেনেছে, তা' হোল—মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা। আর সেটাই হোল অত্যন্ত শক্তিশালী একটা অস্ত্র। কারণ এইসব লোকেরা দেখতে পায় যে যখন তাদের দণ্ডিত করা হয়, তখন তাদের প্রাণে মেরে ফেলা হয় না; শুধুমাত্র তাদের যা' হারাতে হয় তা' হোল তাদের পুরোনো জীবন আর তাদের সামনে থাকে এক নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি। তারা দেখে যে জনগণ আর তাদের ভয় করতে চায় না, পরিবর্তে তারা এই দায়িত্বই তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায় যে আগামীদিনের জন্য তারা যেন নিজেদেরকে এমনভাবে প্রস্তুত করে যা'তে তারা সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পাবার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

একদিন এই খামারকুলভ্‌ই ছিল এক বর্বর শত্রু। তার মনে হোত যে কিস্‌লাকে তার রাজত্বকে নিকেশ করে দিতে চায় সোভিয়েত সরকার। তাই সোভিয়েত সরকারকে সে ঘৃণা করত আর গ্রামে সমাজতন্ত্রের ভিত্‌টাকে নড়বড়ে করে দিতে সে চেষ্টার কোন কসুর করত না। এ ব্যাপারে অপপ্রচার তো করতোই এমনকি যখন এক কিলোগ্রাম রুটির মূল্য মনে হোত এক টন, সেই নিদারুণ সংকটের ও প্রচণ্ড অসুবিধার দিনগুলোতে খাদ্যশস্য নষ্ট করার মত হীন কাজের সংগেও সে নিজেকে যুক্ত করেছিল। কিস্‌লাকের পুরোনো বাত্রাক্‌রাই খামারকুলভের ঐসব নাশকতামূলক কাজকর্মকে ফাঁস করে দিয়েছিল। খামারকুলভ্‌কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং দেওয়া হয়েছিল দশ বছরের দণ্ড।

তখন ফ্রুন্‌জ থেকে রাইবাচিই পর্যন্ত রাস্তা তৈরীর কাজ সবেমাত্র শুরু হতে চলেছিল। অথচ লোকজনের খুবই অভাব। বেশ কিছু বন্দীকে সেখানে কাজ করতে পাঠানো হয়েছিল (প্রসঙ্গতঃ এটা মনে রাখতে হবে যে বুর্জোয়ারা যেভাবে প্রচার করে থাকে আসল ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তার উল্টো, অর্থাৎ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বন্দীদের কখনও সস্তার শ্রমিক মনে করা হয় না। নির্মাণকার্যের কর্তৃপক্ষ মুক্ত শ্রমিকদের যে মজুরি দিত বন্দীদেরও দিত ঐ একই মজুরি। বরঞ্চ বলতে গেলে বন্দীরা বেশ দামী শ্রমিকই কারণ আসল মজুরির সঙ্গে তাদেরকে পাহারা দেবার খরচপত্তর যোগ করলে হিসেবের অঙ্কটা সেরকমই দাঁড়াতো। তবে কোন আর্থিক কারণেই বন্দীদের কাজকর্মে লাগানো হোত না, আসল উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত কর্মক্ষম মানুষকে কাজে লাগানো, সর্বোপরি 'পুরোনো' ধরণের লোকজনকে নতুন মানুষে

পরিণত করা, সত্যিকারের মানুষে পরিণত করা, সোভিয়েতের নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।) খামারকুলভ্‌ও ছিল সেই কাজ করার জায়গায়। খামারকুলভ্‌ ছিল একজন সক্ষম মানুষ তাছাড়া লুকিয়ে চুরিয়ে কোন কিছু করার এক বিশেষ ক্ষমতা ছিল তার। তাকে একটা ব্রিগেডের নেতা করে দেওয়া হয়েছিল, আর যা'তে করে সে ঐ ব্রিগেডের জন্য তার পছন্দ মত লোকজনকে খুঁজে আনতে পারে এরকম সুযোগও তাকে দেওয়া হয়েছিল। সে বেশী ভাবল না, শুধুমাত্র পুরোনো দিনের কুলাক্‌দেরই তার ব্রিগেডের জন্য নিয়ে এলো, যেহেতু তারা ছিল তার কাছের লোক। আর তাদের নিয়ে সে বেশ ভালোভাবেই চালিয়ে যাচ্ছিল। যখন কাজের বিরতি থাকত, সেই সময়ের ফাঁকটুকুতে তারা জড়ো হোত, তাদের হারানো ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির স্বপ্ন দেখত আর কিভাবে পালানো যায় এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে তারা আলোচনা করত। আর যাতে কেউ তাদের সন্দেহ না করে, এ ধারণা সৃষ্টি করার জন্য তারা ঠিক করেছিল যে তারা ভালভাবে কাজ করবে।

এভাবে দু'টো মাস কাটতে না কাটতেই তাদের মনে হোল সেই ব্রাহ্মমুহূর্তটা এসে গেছে। ইতিমধ্যেই খামারকুলভ্‌ পালাবার দিনক্ষণও ঠিক করে ফেলেছিল। কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট তারিখের দিন কয়েক আগে এক সন্ধ্যায় ক্যাম্পের প্রধান একটা মিটিং ডাকলেন। তিনি সেখানে কয়েকটা ব্রিগেডের নাম উল্লেখ করলেন যারা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিল। তাছাড়া খামারকুলভ্‌কে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত করা হোল, যে এমন একজনে পরিণত হয়েছে সে যা' সে কোন দিনই ছিল না। সেই রাতে তার ও তার ব্রিগেডের, কারুরই ঘুম হোল না। পরের দিন তাদের আগের পরিকল্পনাকে তারা আর কার্যকর করল না। এদিকে ঐ দিনেই ইসিয়াসেভ্‌-এর ব্রিগেড্‌ আরও এগিয়ে গেল এবং এক মাসের জন্য ঐ অঞ্চলের লাল পতাকার অধিকারী হোল।

ইসিয়াসেভের ঐ এগিয়ে যাওয়াকে খামারকুলভ্‌ ব্যক্তিগত অপমান হিসেবেই গ্রহণ করল। তার এটাই মনে হোল যে আগের দিনের মিটিং-এ তার প্রতি যে সম্মান দেখানো হয়েছিল. তার বেশ কিছুটা ইসিয়াসেভ্‌ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। সে তার সম্মানের সবটুকুই ফিরে পেতে চাইল। ব্রিগেডের প্রধান হিসেবে সে নিজেই লাল পতাকাকে বহন করতে চাইল।

পালিয়ে যাবার ব্যাপারটাকে তারা এক মাসের জন্য স্থগিত রাখল এবং পরের মাসেই সেই লাল পতাকা স্থানান্তরিত হোল খামারকুলভ্‌দের হাতে। কিন্তু তখনও তাদের পক্ষে পালানো সম্ভব হোল না। তাদের কাছে তখন এটাই জরুরী হয়ে দাঁড়াল যে ইসিয়াসেভ্‌ ও 'শোধনের অতীত' বলে কথিত চোর-ছ্যাঁচোড়দের নিয়ে

গড়া কোন্দ্রিয়াকভ্-এর ব্রিগেডের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিভাবে তারা লাল পতাকার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবে।

এভাবেই একটা বছর কেটে গেল। খামারকুলভ্‌দের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য কোন্দ্রিয়াকভ্‌রা ব্যর্থ প্রয়াস চালালো ; আর কোন্দ্রিয়াকভ্‌দের দিকে বিজয়ের দৃষ্টি হেনে খামারকুলভ্‌রা প্রতিদিনই সেই লাল পতাকা নিয়ে ক্যাম্প থেকে বের হোত। এরপর থেকে কোন্দ্রিয়াকভ্‌কে খামারকুলভের ব্রিগেডের আশেপাশেই থাকতে দেখা যেত। তারা কেমনভাবে কাজ করে, তাদের সংগঠনটাও বা কেমন এসব সে লক্ষ্য করত। এমন কি খামারকুলভ্‌কেও সে লক্ষ্য করত। খামারকুলভের প্রতি তিক্ততা ভুলে পরিবর্তে খেলোয়াড়ী ভঙ্গীতে কোন্দ্রিয়াকভ্ তাকে বিজয়ীর সম্মান জানালো, শিক্ষকের সম্মান দেখালো।

এখন গ্রেট কিরঘিজ্ হাইওয়ের প্রথম অংশ নির্মাণের শেষ মাসের কাজ চলছে। গোটা কলোনীর সবাই ক্লাবে এসে জড়ো হয়েছে, কেউই বাইরে নেই, কারণ খামারকুলভ্ তারই প্রতিদ্বন্দ্বী কোন্দ্রিয়াকভের হাতে আজই লাল পতাকা তুলে দেবে। মাসের শেষে খামারকুলভ্ আর পেরে উঠল না। সে যখন পরিকল্পনার শতকরা একশো উনআশী ভাগ সম্পন্ন করেছে, তখন কোন্দ্রিয়াকভের ব্রিগেড্ সম্পন্ন করেছে একশো পঁচাশী ভাগ।

খামারকুলভ্‌কে দেখা গেল দারুণ আলোড়িত। চোখের দু' কূল ছাপিয়ে অশ্রুর ধারা তার গালের উঁচু হাড়ের ওপর জ্বলজ্বল করতে থাকল, তার কণ্ঠস্বরেও লাগল কম্পের দোলা। সে বলল : "নাগরিক কোন্দ্রিয়াকভ্—তোমার হাতে আমি তুলে দিলাম ..."

একটা নতুন টুপি মাথায় পরেছে কোন্দ্রিয়াকভ্। ঐ মহান মুহূর্তে ওটাকে মাথা থেকে খোলার কথা সে স্বাভাবিকভাবেই ভুলে গেল আর ঐ অবস্থাতেই কোন্দ্রিয়াকভ্ পতাকাটা গ্রহণ করল এবং একটা বক্তৃতা দিল :

"আমরা জিতেছি, কারণ কাদির অর্থাৎ খামারকুলভ্ আমাদের অনেক বেশী কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছিল। নাগরিকরা, আপনারা শুনুন, আমি নিজে একজন রুশ এবং এই ব্যাপারটাই গোড়া থেকে আমাকে লজ্জায় নাড়া দিত যে একজন কিরঘিজ্ আমার চেয়ে এগিয়ে থাকবে! মোটামুটিভাবে এটাই আমি বলতে চাইছি যে বৃহৎ রুশজাতিসুলভ দাম্ভিকতাকে আমি প্রশ্রয় দিয়েছিলাম, যেভাবে নাগরিক সেনাধ্যক্ষ এইমাত্র তা' বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখন আমি বুঝেছি যে কিরঘিজ্‌রা আমাদেরই ভাই। কাদির যে অতখানি করতে পেরেছিল, কারণ সে এটাই আমার চেয়ে অনেক ভালভাবে বুঝতে পেরেছিল। নাগরিকরা, আমি

আপনাদের এটাই বলতে চাই, যে আমি তার কাছ থেকেই শিখেছি ; তাই আমি বলতে চাই যে পতাকাটা আধাআধিভাবে আমাদের দু'জনেরই···যা হোক ···”

কোন্দ্রিয়াকভ্ দেখিয়ে দিল ঐ 'যা হোক' বলতে সে কি বোঝাতে চেয়েছিল। সে খামারকুলভ্‌কে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরল ও খামারকুলভের কাঁধে পতাকাদণ্ডটাকে চেপে ধরল। খামারকুলভ্‌ও কোন্দ্রিয়াকভ্‌কে জড়িয়ে ধরল। পতাকাদণ্ডটাও আস্তে আস্তে কোন্দ্রিয়াকভের হাত থেকে ফসকে গেল এবং দেখা গেল লাল কাপড়ের আবরণে ঢাকা পড়েছে দু'জনেরই মুখমণ্ডল, মনে হচ্ছিল যেন একটা লাল ওড়্না ঢেকে দিয়েছে দু'জনের মুখমণ্ডল ···।

এরকম একটা দৃশ্য হয়ত থিয়েটারে অভিনীত হতে পারে, কিন্তু এখানে বাস্তবেই এটা ঘটল এবং নাটকীয়কতার কিছুমাত্র এতে রইল না।

নভেম্বরের সাত তারিখে যানবাহন চলাচলের জন্য নতুন রাস্তাটাকে খুলে দেওয়া হোল। ঐদিনই খামারকুলভ্‌কে বলা হোল যে সে স্বাধীন, আবার তাকে নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হোল এবং বলা হোল অন্য যে কোন সোভিয়েত নাগরিকের মত সে জীবনযাপন করতে পারবে। ঘোষণা করা হোল, খামারকুলভ্, কোন্দ্রিয়াকভ্ ও ইসিয়াসেভ্ এবং অন্যান্য শত শত ঝটিকা-শ্রমিক যারা এককালে চোর, কুলাক্ ও বাসমাচ্‌দের মধ্যে থেকে এসেছিল, তাদের সবাই ঐ অধিকার ফিরে পাবে। যদিও তারা আগে থেকেই এটা জানত আর তাই সেই অনুযায়ী তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের পরিকল্পনা তৈরী করে রেখেছিল। কেউ হয়ত বাড়ী ফিরে যাবে, কেউ হয়ত ইস্কুলে যোগ দেবে, আবার কেউ কেউ হয়ত রাস্তা নির্মাণের সেই কাজেই লেগে থাকবে যা' তাদের কাছে দিনে দিনে প্রিয় হয়ে উঠেছে।

খামারকুলভ্ কোথাও গেল না, ওখানেই থেকে গেল। আমি জানি না, যখন গ্রেট কিরঘিজ্ হাইওয়ে নির্মাণের সমগ্র কাজটাই শেষ হয়ে যাবে, যে রাস্তা তান্-সানের দূর অথচ সমৃদ্ধ উপত্যকায় জীবনের বার্তা বহন করবে, তখন সে কি করবে!

প্যারী কমিউনের জনগণ

॥ মস্কো, মার্চ ১৮, ১৯৩৫ ॥

সযত্নে কাদামাখা রাস্তা পেরিয়ে নাগরিক পেচার্ড এগিয়ে চলেছিল। অনেকটা আনমনাভাবেই সে পথ হাঁটছিল। চোদ্দ বছর ধরে রাস্তুল এর কারখানায় কাজ করতে করতে তার এই অভ্যাসটা হয়ে গিয়েছিল, আর বলতে গেলে সেই অভ্যাসের বশেই সে আজ এখানে এসে পড়েছে। সারাদিন ধরে সে এভাবেই প্যারী শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পথে পথে রক্ষীরা যেসব ব্যারিকেড্ গড়ে তুলেছে সেগুলোর মধ্যে দিয়েই সে ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু সন্ধ্যার দিকে সে আর দূরে থাকতে পারল না। রাস্তুলের কারখানার চত্বর থেকে দূরে একটা দিনই কত না শূন্যগর্ভ মনে হোত তার কাছে! আর যে তিক্ততার পরিবেশ তার চারধারে গড়ে উঠেছে, তা' রাস্তুলের হাজার গালিগালাজের চেয়েও বেশী তীক্ষ্ণ বলে মনে হচ্ছিল তার কাছে।

ফটক্টা বন্ধই রয়েছে! পেচার্ড এটা জানত, তবুও এবিষয়ে নিশ্চিত হবার কোন চেষ্টাই সে করেনি। ওয়ার্কশপের জীর্ণ-মলিন জানলায় সে মুখ রাখল। অন্ধকারের সঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটা মিশে এক ধরণের নোংরা বিষাদের পরিবেশ গড়ে উঠেছে, এক ধরণের হতাশার আবহাওয়া গোটা ওয়ার্কশপ্ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এসত্ত্বেও পেচার্ড দেখতে পেল পরিত্যক্ত ছাপাখানা, তেলের বোতল, সব পুরু ধুলোয় মাখামাখি। তার মানস-চোখে সে যেন দেখতে পেল, যা কিছু সে দীর্ঘ চোদ্দটা বছর ধরে দেখেছে, সেগুলোকে সে কিছুতেই মাত্র তিরিশ দিনে ভুলে যেতে পারছে না।

এই চোদ্দ বছরে মাত্র দু'বারই সে রাস্তুলের ওয়ার্কশপে যাবার রাস্তাটা পেরোতে ভুলে গিয়েছিল। প্রথম বার তার বিয়ের দিনে এবং দ্বিতীয় বার ঠিক সেই এক মাস আগে, মার্চ মাসের সেই সকালবেলায়, যখন শহরতলীতে ব্যারিকেড্ গড়া হয়েছিল, আর সৈন্যরা তাদের বন্দুকের বাঁটগুলো মাটির দিকে রেখে অফিসারদের টেনে নিয়ে চলেছিল বোসিও স্ট্রীটের আদালতে, তখন এক বিপুল জনস্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মত্‌মার্ত্রে'তে।

সেদিন থেকেই ম'সিয়ে রাস্তুলকে সে আর দেখেনি ; শুধুমাত্র ওয়ার্কশপের দরজায় ব্যর্থতার হাত চাপড়েছে। ম'সিয়ে রাস্তুল আর প্যারীতে নেই। সেদিন পেচার্ডের অনুপস্থিতিতে মনে হচ্ছিল বোধহয় ওয়ার্কশপ্‌টা আর সেরকম স্বাভাবিক নেই, অবলীলায় চলতে পারে এমন মেশিনটাকেই যেন সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ক্রমে রাস্তুলের কানে এলো উত্তেজিত কথাবার্তার শব্দ, আর তিনি তাকিয়ে দেখলেন শ্রমিকদের সংখ্যাও কমে এসেছে, তারপর যখন রাস্তা থেকে কানে ভেসে এলো চিৎকার চেঁচামেচি তখন তিনি বিপ্লবের গন্ধ পেলেন। কাজ থামাবার জন্য তিনি অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করতে থাকলেন। শ্রীমতী রা স্তল ইতিমধ্যেই বোচকাবুচকি নিয়ে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, একটা গাড়ীও দরজা বন্ধ করে চত্বরেই অপেক্ষা করছিল। ম'সিয়ে রাস্তুল বেশ শক্ত হাতেই ধরে রেখেছিলেন একটা স্টীলের বাক্স, যার মধ্যে ছিল ফ্রাঁ, আংটি, কানের দুল এবং আরও কত কি ! তিনি ভীতসন্ত্রস্তভাবে টেনে নিয়ে এলেন তার কন্যাটিকে, যে এদিকে সযত্নে চেষ্টা চালাচ্ছিল যাতে তার স্কার্টের ভাঁজ এতটুকুও নষ্ট না হয়।

দরজা বন্ধ গাড়ীগুলো ঊর্দ্ধশ্বাসে প্যারী শহরের ফটকের বাইরে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল, যেন এক শোকমিছিল। ম'সিয়ে রাস্তুল তাঁর শার্টের উঁচু কলারের ওপর দিয়ে আড়চোখে একটু তাকিয়ে নিয়েছিলেন, এবং নিজের সিদ্ধান্তটাকে আর একবারের মত ঝালিয়ে নিয়েছিলেন। না, কেউই তাদের থামায়নি। সম্ভবতঃ তিনি একটা ভুলই করেছিলেন ! হয়ত, তাঁরা অযথাই ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলেন। বিপ্লব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্য কিছু তিনি ভেবেছিলেন। তাঁর হাতেই যে ছিল পেচার্ডদের জীবনের বোঝা, যে জীবনগুলোকে ফ্রাঁ, সোনা ও জড়োয়ার সঙ্গে ঐ স্টীলের বাক্সে তিনি আটকে রেখেছিলেন, তা' তিনি অনুভবই করতে পারেননি। বাক্সটা ছিল যথেষ্ট ভারী আর বিপ্লব সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অন্য ধারণাই করেছিলেন।

পরিত্যক্ত রাস্তাগুলোর মধ্যে দিয়ে গাড়ী চালিয়ে চলেছিলেন তারা। দ্রুত বাঁক নিচ্ছিলেন যা'তে করে জনগণের ভীড়কে এড়ানো যায়। এদিকে জনগণ মেতেছিল আনন্দে, কাঁধ থেকে রাইফেল ঝুলিয়ে কুচকাওয়াজ করছিল তারা। ম'সিয়ে রাস্তুল এক অসুখী দুশ্চিন্তায় মাঝে মাঝেই কেঁপে উঠছিলেন, শ্রীমতী রাস্তুল ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন আর তাদের কন্যাটি অগোছালভাবে স্কার্টের এম্‌ব্রয়ডারির কাজগুলোকে ঠিকঠাক করছিল।

অথচ কিছুই ঘটল না। কোনও ঘটনা ছাড়াই তাঁরা ভার্সাইতে পৌঁছলেন।

আর এখন সেখানে বসে, সেই ম'সিয়ে রাস্তুল কমিউনের পতনের দিকে

চেয়ে ক্রোধের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন। খুবই উচ্চকণ্ঠে তোষামোদকারী লোকজনদের গল্প বলে চলেছেন, কমিউনের বর্বরতার গল্প, যা তিনি কখনই প্রত্যক্ষ করেননি। আর সন্ধ্যাবেলায় তাঁর প্রাক্তন কর্মচারীদের তালিকা হাতে নিয়ে এই বলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন যে তাদের জন্যই তার নাকি ঋণ হয়ে গেছে বাজারে, তাদের জন্য তিনি নাকি খরচই করেছেন বিনিময়ে পাননি কিছুই।

আর তখনই প্যারীতে বেকার পেচার্ড বন্ধ ওয়ার্কশপের দরজায় দাঁড়িয়ে। বৃষ্টি ও অন্ধকারের ধোঁয়াশার মধ্যে দিয়ে সযত্ন দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিল ধুলোমাখা পরিত্যক্ত সেই ছাপাখানা ও তেলের বোতলের দিকে।

শুধু অভ্যাসের জোরেই রাস্তলের ওয়ার্কশপে যাবার রাস্তাটা পেরিয়ে এলো সে। একটা ভেজা ছেড়া খোঁড়া বিজ্ঞপ্তি দরজা থেকে ঝুলছে, অযত্নে সাঁটা কাগজের একটা দিক বাতাসে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। কোটের তলা থেকে পেচার্ড তার হাতটা বাড়িয়ে দিল আর আঙুল দিয়ে ঐ অশান্ত বিজ্ঞপ্তিটাকে দরজার ওপর চেপে ধরল।

পেচার্ড পড়তে থাকল। কাছাকাছি ভার্সাই থেকে কামানের শব্দ ভেসে আসছিল, কিন্তু সে একবারের জন্যও মাথা তুলল না। ওদিকে, আহা! প্যারীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে কি দারুণ ঘৃণার সঙ্গেই না মঁসিয়ে রাস্তল তাঁর কর্মচারীদের তালিকাটার ওপর চোখ বোলাচ্ছিলেন।

পেচার্ড বিজ্ঞপ্তিটা পড়ে ফেলল, বেশ কয়েকবারই পড়ে ফেলল।

দি প্যারী কমিউন লক্ষ্য করছে যে অনেক মালিকরাই তাদের ওয়ার্কশপ্‌গুলোকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রেখেছে এবং এভাবেই তারা নাগরিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দিচ্ছে না ও তাদের শ্রমিকদের স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে চাইছে না। কমিউন আরও লক্ষ্য করছে যে ভীরু কাপুরুষের মত তাদের পালিয়ে যাওয়ায় শহরের জীবনযাত্রার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজকর্মগুলো ব্যাহত হচ্ছে এবং শ্রমিকদের অস্তিত্বই বিপন্ন হচ্ছে। আর এসব বিবেচনা করে কমিউন ঘোষণা করছে যে ঃ

ওয়ার্কার্স ট্রেড এ্যাসোশিয়েশন একটা তদন্ত কমিশন সংগঠিত করার আহ্বান জানাচ্ছে, যার কাজ হবে ঃ

১। পরিত্যক্ত ওয়ার্কশপ্‌গুলোর একটা তালিকা প্রস্তুত করা, যে অবস্থায় সেগুলো রয়েছে তার সঠিক বর্ণনা প্রস্তুত করা এবং সেগুলোতে যেসব যন্ত্রপাতি রয়েছে তার তালিকা প্রস্তুত করা।

২। যাতে ঐ সকল ওয়ার্কশপে অবিলম্বে কাজ শুরু করা যায় তার জন্য বাস্তবিক যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে তার রিপোর্ট দাখিল

করা। তবে এই কাজটা অবশ্যই করতে হবে পলাতক সেইসব মালিক যারা শ্রমিকদের এভাবে ভাগ্যের মুখে ঠেলে দিয়েছে তাদের জোরে নয়, সেখানের শ্রমিকদের সমবায় সমিতিগুলোর জোরেই।

৩। শ্রমিকদের সমবায় সমিতিগুলোর নিয়মকানুনের খসড়া প্রস্তুত করা।

৪। সালিশীর জন্য একটা আদালত নিয়োগ করা যাতে করে ঘটনাক্রমে মালিকেরা যদি ফিরে আসে তবে সেই পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের সমবায়গুলোর হাতে ওয়ার্কশপ্‌গুলোর মালিকানা হস্তান্তর করার সুনির্দিষ্ট শর্তগুলো নির্দ্ধারণ করা যায় এবং কতটা পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রাক্তন মালিকদের সমবায়গুলো দিতে বাধ্য থাকবে তাও নির্দ্ধারণ করা যায় ···।

অবশেষে কমিউনের নির্দেশনামা সম্বলিত সেই ভেজা বিজ্ঞপ্তিটা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল পেচার্ড। উদ্দেশ্যহীনভাবে পথ চলতে শুরু করল। বেশ খুশী মনেই ওয়ার্কশপের দিকে তাকালো সে, তাকাল সেই জীর্ণ-মলিন খড়খড়ি লাগানো জানলার দিকে আর তার পেছনে জমে থাকা বিষণ্ণ অন্ধকারের দিকে। অনভ্যাসের ভঙ্গীতে দ্রুত রাস্তাটা পেরিয়ে গেল সে। একটা খুশী খুশী ভাব তার অনুভূতিকে ছুঁয়ে রইল। সে অনুভব করল যেন তার হাত ছুঁয়ে আছে ছাপাখানার লিভারটা আর সে যেন শুনতে পাচ্ছে ওয়ার্কশপের সেই পরিচিত চেঁচামেচি, শুধুমাত্র একটা শব্দই যেন কোথায় হারিয়ে গেছে, আর তা' হোল মঁসিয়ে রাস্তলের সেই ঝন্‌ঝাটে কণ্ঠস্বর।

চারদিকে জমাট অন্ধকার, তবুও সেই গাছগাছালিতে সাজানো প্রশস্ত রাস্তাটাকে মনে হচ্ছে কত প্রাণময়। লোকজনদের পরনে আধা-উর্দি আর তারা আলোচনা করছে ভার্সাই আক্রমণের ব্যর্থতা নিয়ে। বিপ্লবের লাল-নীল টুপী মাথায় চড়িয়ে এক মহিলা তার ভাঁজ করা হাতদু'টো রাইফেলের ওপর এলিয়ে দিয়েছে আর ক্লেয়ার ফুর্নিয়ের বিষয়ে বলে চলেছে এক মজার গল্প, সে বলছে যে প্যারীর ব্যারিকেডে দাঁড়িয়েই নাকি জীবনে সর্বপ্রথম বন্দুকে গুলি ভরেছিল ক্লেয়ার ফুর্নিয়ে। গির্জা থেকে এক ফালি আলো এসে পড়েছে সদ্য প্রস্ফুটিত গাছের কচি পাতাগুলোর ওপর। সময়টা বসন্তকাল। আর গির্জার প্রবেশ পথেই সবেমাত্র রঙ্‌ করা একটা বোর্ড ঝুলছে : ফাদার দ্যুঁসের ক্লাব।

কেউ কেউ অর্গানে কারমাগনোল্‌ এর সুর তোলার আন্তরিক চেষ্টা করে চলেছে। ঘোড়ার খুরের শব্দে ও গাড়ীর চাকার শব্দে রাস্তার খোয়া পাথরগুলো মুখর হয়ে উঠ্‌ছে। কারা সাঁ ক্লাউড্‌ এর ফটক্‌ থেকে একজন কমিউনার্ডকে এইমাত্র

বয়ে নিয়ে এলো। বাতাসে ভাসছে একই সঙ্গে বসন্তের মাটির গন্ধ ও বোরস্ দ্য বোলোন্ এর বারুদের গন্ধ।

দিনটা ছিল ১৮৭১ সালের ১৭ই এপ্রিলের সন্ধ্যা।

রোজ যেমন উঠে থাকে তার থেকে আগেই সেদিন ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল পিওতর। সেই ওয়ার্কশপ্‌গুলো, যেগুলোকে তাদের মালিকরা পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রেখেছিল, সেগুলো সম্পর্কে প্যারী কমিউনের নির্দেশনামাগুলোকে খুবই যত্নের সঙ্গে আরও একবার পড়ে ফেলল সে। এবার সে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। বাইরে সাদা কুয়াশা মাখা শীতের ঠাণ্ডা সকাল। নদীটা সে পেরিয়ে গেল। একটা ছোট ভাঙ্গাচোরা ষ্টীমার অসহায়ভাবে নদীটার বুকে ভেসে ছিল। একটা বাঁক নিয়ে পাশের রাস্তায় ঢুকে পড়ল পিওতর। রাস্তাটা সোজা চলে গেছে সেই কারখানার পাকা বাড়ীটার দিকে, যেটাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে গেছেন শ্রীযুক্ত মিখাইলভ্।

সেখানে ওয়ার্কশপের মেঝেতে তাঁতগুলো প্রাণহীন পড়ে রয়েছে এবং শবাধারের ওপর যেমনভাবে মাটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়, সেভাবেই চলে যাওয়া দিন-গুলো ওগুলোর ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে ধুলো! আর চত্বরে এখনও স্তূপীকৃত পড়ে রয়েছে হাল্কা কামানের গোলার খোলগুলো। শ্রীযুক্ত মিখাইলভ্ ছিলেন একজন পাকা ব্যবসাদার এবং নানা পরীক্ষামূলক ব্যাপারেও যথেষ্ট ঝুঁকি নিতে পারতেন তিনি। বছরের পর বছর ধরে সেইসব খদ্দেরদের যুগিয়ে গিয়েছিলেন সব সুন্দর সুন্দর ইংরেজী ধাঁচের গরমের কাপডচোপড়, যেসব খদ্দেরদের খুশী করার ব্যাপারটা মোটেই সহজ ছিল না। আর তার ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টটাও বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। এদিকে যুদ্ধ বেধে গেল আর মনে হোল যুদ্ধ বুঝি তার ঐ প্রাচুর্যের বৃদ্ধিতে বেশ বড় সড় একটা আঘাত হেনে ফেলবে, কিন্তু শ্রীযুক্ত মিখাইলভ্ তার জন্য আগেভাগেই প্রস্তুত ছিলেন। দেখা দিল কাঁচামালের সমস্যা। কোথায় পাওয়া যাবে সেইসব কাঁচামাল? যদিও অন্য অনেক কিছুই থেকে গিয়েছিল যা' থেকে হয়ত অন্য কিছু প্রস্তুত করা যেত। কিন্তু এসত্ত্বেও তার বাছাই করা খদ্দেরের সংখ্যা কি কমে যাচ্ছিল না? তার তৈরী গরম কাপড়ের পোষাক পরতে পারে এমন লোকের সংখ্যা কি কমে যাচ্ছিল না? ঠিকই এসব হচ্ছিল। কিন্তু এতে ঘাবড়াবার কি আছে! নতুন কোন পণ্য তো উৎপাদন করা যেতে পারত। আর সে করলও তাই। নতুন পণ্যের স্বার্থে অনেক লোককেই শুষে নিংড়ে একেবারে ছিবড়ে করে ফেলা হোল। শ্রীযুক্ত মিখাইলভ্ হিসাব-কষে দেখলেন, বয়ন কারখানা থেকে তার যা' রোজকার হচ্ছিল, ওয়ার্কশপ্ থেকে তিনি কিছু কম কামাবেন না।

ছেলেরা চলে গেল যুদ্ধক্ষেত্রে, মেয়েরা নেমে এলো রাস্তায়। বয়ন কারখানাটা বন্ধ করে দেওয়া হোল আর কারখানার রিপেয়ারিংশপ্‌টাকে পরিণত করা হোল গোলাবারুদের ওয়ার্কশপে। শ্রীযুক্ত মিখাইলভ্‌ নতুন খদ্দেরদের যোগান দিতে থাকলেন ভাল ইস্পাতের তৈরী গোলাবারুদের খোল আর তার ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকল।

না, যুদ্ধ শ্রীযুক্ত মিখাইলভ্‌কে এতটুকুও জব্দ করতে পারল না। তার জমা টাকার পরিমাণটা বেড়েই চলল, যুদ্ধ তা'কে ওসব কিছু থেকে এতটুকুও হঠিয়ে দিতে পারল না। এভাবেই দিব্যি চলে যাচ্ছিল শ্রীযুক্ত মিখাইলভের।

কিন্তু অবশেষে দিন এসে গেল। সেদিন রাস্তায় রাস্তায় উঠল চিৎকার চেঁচামেচি। আর সেই গোলমাল তার অফিসের মধ্যেও জোর করে ঢুকে পড়ল। তার ব্যবসায়ী মাংসল নাকে গিয়ে পৌঁছল বিপ্লবের গন্ধ।

চুপ করুন! ভদ্রলোকেরা, আপাততঃ চুপ করে থাকুন!

হতভাগ্য মঁসিয়ে রাস্তল ভার্সাই যাবার গোটা পথটা ধরে এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই আন্দোলিত হয়েছিলেন, যে তার সেই পালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনটা ছিল কি ছিল না। কিন্তু শ্রীযুক্ত মিখাইলভ্‌ এরকম কোন চিন্তাবিবর্জিত কাজ করার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না যা'র মধ্যে সন্দেহের বা দ্বন্দ্বের কিছু থেকে যেতে পারে। তিনি হিসেব কষেই ফেললেন এবং নির্দ্বিধায় বৃদ্ধ রাস্তলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সেই বয়নের ও গোলাবারুদের খোল তৈরীর কারখানা ছেড়ে দ্রুত পালিয়ে গেলেন।

ওয়ার্কশপের মেঝেতে তাঁতগুলো প্রাণহীন পড়ে ছিল এবং কবর খননকারীরা শবাধারের ওপর যেমনভাবে মাটি ছড়িয়ে দেয়, চলে যাওয়া দিনগুলো সেভাবেই ওগুলোর ওপর ছড়িয়ে দিয়েছিল ধুলো। কারখানার চত্বরে চারদিকে স্তূপীকৃত পড়েছিল গোলাবারুদের খালি খোলগুলো। যখন পিওতরের বন্ধুরা, নতুন ম্যানেজার হিসাবে ঐ পরিত্যক্ত কারখানার দরজাগুলোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তারা এসব দেখতে পেল। আর পিওতরের বন্ধুরা বয়ন-শ্রমিক বা যন্ত্র-শ্রমিক কোনটাই ছিল না, তারা ছিল স্রেফ একদল জুতো-নির্মাতা।

ঝুলের মত ধুলোময়লা দেওয়ালগুলোতেও জমে উঠেছিল; এমনকি না-ধোওয়া জানলাগুলো দিয়ে দিনের বেলা যে সূর্যালোক আসছিল তাও যেন ধুলোয় মলিন হয়ে যাচ্ছিল। প্রবেশকারীরা একটা ওয়ার্কশপের দখল নিয়ে নিল। তারা বিদায় করে দিল হতাশা ও বিষাদের নৈঃশব্দ। তাঁতগুলোকে খুলে ফেলল তারা, আর সেগুলোকে ভাঁড়ার ঘরে রেখে দিয়ে এলো। ওগুলো তাদের কোন কাজেই আসত না, কারণ এমন কোন ভাল পশম তাদের ছিল না, যা'র জন্য তারা প্রলুব্ধ

বোধ করতে পারত। মেয়েরা তাদের স্কার্টগুলোকে গুটিয়ে নিল এবং ওয়ার্কশপের মেঝেটা ঘষে পরিষ্কার করতে শুরু করল। আর ছেলেরা প্রথম সেলাইকলটাকে (জার্মানরা এসে পড়লে যুদ্ধের এলাকা থেকে এই সেলাইকলটাকে নিয়েই এর মালিক পালিয়ে এসেছিল) সেখানেই জুড়ে ফেলল এবং নিজেরা তেপায়া টুলগুলোর ওপর বসে পড়ল। ওয়ার্কশপ্‌টার আবার মনে পড়ল তাঁতের সেই খটাখট্ শব্দের কথা। আর যখন বুড়ো কারিগরদের হাতুড়িগুলো দুমদাম পড়তে থাকল তখন সেই শব্দে ওয়ার্কশপ্‌টা যেন হাসতে থাকল।

পরিত্যক্ত মৃত শ্রীযুক্ত মিখাইলভের সেই কারখানায় জীবন আবার নতুন করে শুরু হোল।

বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গিয়েছিল পিওতর, আর সেই অবস্থাতেই এসে ঢুকল ওয়ার্কশপে। হাতে ধরা চামড়া ও ছুরিটা তাকে প্রায় চুপ করিয়েই রেখেছিল আর দেওয়ালে লটকানো লাল পোস্টারটা একথাই তাকে বারে বারে মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে উৎসব বার্ষিকীর আজকের সভায় তোমাকে বক্তৃতা করতে হবে।

সভা শুরুতে তখনও অনেক সময় বাকী। কিন্তু ইতিমধ্যেই ট্রান্সমিশন্ বেল্টের চাকা থেমে গেছে, হাতুড়িগুলোও সব চুপ হয়ে গেছে। ওয়ার্কশপ্ থেকে চল্লিশ জন এসে ভিড় করেছে সেই ঘরটায়, যেটা একদিন শ্রীযুক্ত মিখাইলভের অফিসঘর ছিল এবং বর্তমানে হয়েছে শ্রমিকদের ক্লাব। ঘরের এক কোণে টান টান করে টাঙানো একটা লাল পতাকা।

পিওতর বক্তৃতা করল। প্যারী কমিউনের বিষয়ে সে অনেক কথাই বলল। পিওতরের পর অন্য আরও অনেকে বক্তৃতা করল। বক্তৃতায় তারা স্মৃতিচারণা করল, তুলনামূলক নানা উদাহরণ তুলে ধরল, আর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে নানা কথা বলল তারা। যে উদাহরণ তারা সৃষ্টি কবতে পেরেছে তার কথাও যেমন তারা বলল, সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজেদের ভুলত্রুটির কথাও বলল, যাতে করে ভুলত্রুটিগুলো থেকে সবাই শিখতে পারে। মালিকদের দ্বারা পরিত্যক্ত ওয়ার্কশপ্‌গুলো সম্পর্কে কমিউনের নির্দেশনামাগুলো তারা পড়তে থাকল আর পরস্পরের দিকে গর্বভরে তাকাতে থাকল। শ্রীযুক্ত মিখাইলভের ছাইপড়া আশার কথা ভেবে তারা সবাই হাসতে থাকল।

আর ঠিক তখনই এই প্রস্তাবটাকে উত্থাপন করা হোল :

প্যারী কমিউনের সেই নিহত যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধায়, প্রথম সর্বহারা একনায়কত্বের প্রতি শ্রদ্ধায়, আমাদের কারখানার নাম রাখা হোক, 'প্যারী কমিউন'।

আর সেটা ঘটল মস্কোয়। দিনটা ছিল ১৯২২ এর ১৮ই মার্চ।

পিওতর সেই পেচার্ডকে লিখল, লিখল একখানা চিঠি :

প্রিয় কমরেড পেচার্ড,

সেই তুমি যে প্যারীকে নিজের হাতে নিয়েছিলে, তারপর ষাট্ ষাট্‌টা বছর কেটে গেছে। কত দিন হয়ে গেল, সেই যে তুমি রাস্তলের ওয়ার্কশপ্ ছেড়ে চলে গিয়েছিলে এবং তারপরে সেই ওয়ার্কশপের জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিলে ; যখন তোমার হাত দু'টো জানত না কেমন করে শক্ত হাতে রাইফেল ধরতে হয় যেমনভাবে জানত কেমন করে ছাপাখানার লিভারটাকে চেপে ধরতে হয়। কমরেড পেচার্ড, সেটা একটা ভুল ছিল, একটা মস্ত বড় ভুল ; আর সেই ভুলের জন্যই প্রথমে রাস্তলের পরে তোমার ও সবশেষে সেই রাস্তলের জন্য ওয়ার্কশপের দরজাগুলো চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তোমার মত আমিও মৃত্যুর চেয়ে বেঁচে থাকতেই বেশী ভালবাসি, বিনাশ করার চেয়ে সৃষ্টি করতেই বেশী ভালবাসি, হত্যার চেয়ে কাজকেই বেশী ভালবাসি। ভেড়্ এর কারখানা-মালিক মোরোজোভ্ ও বের্ক হয়ত আমাকে ভুলেই যাবে, কিন্তু তাদের স্ফীত ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টই জানিয়ে দেবে তাদের জন্য আমি কিভাবে খেটেছি। সেই শ্রীযুক্ত মোরোজোভ্ ও শ্রীযুক্ত বের্ক, দু'জনেই হয়ত আমাকে ভুলে গিয়ে থাকবে —কিন্তু আমি কখনও তাদের ভুলিনি, ভুলতে পারিনি। যখন বন্দুকটার ওপর আমি হাত রাখি, তখনই তাদের কথা আমার মনে পড়ে। মনে পড়ে যে তারা যখন আমাকে কাজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তখন তাদের সামনে কিভাবে আমাকে হামাগুড়ি দিতে হয়েছিল আর যখন তারা আবার আমাকে কাজে ফেরৎ নিয়েছিল তখন কিভাবেই না নিঃশেষ হয়ে প্রতিদিন আমাকে বাড়ী ফিরতে হোত! মনে পড়ে আমারই কষ্টের ওপর কেমনভাবেই না তারা বেঁচে ছিল! আমার হাতের অস্ত্রটাকে খুব শক্ত করেই ধরে থাকি আমি, কমরেড পেচার্ড, এত শক্ত করে যা'তে তারা আর কোনদিনই ফিরে আসতে না পারে।

কমরেড, আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়, যখন সেই ওয়ার্কশপ্‌গুলো, যেগুলো মালিকরা পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়েছিল, সেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নির্দেশনামাগুলো পড়তে থাকি। এখানে, অনেক দূরে থেকেও আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে যা' তোমাদের এড়িয়ে যাওয়া উচিত ছিল তা' তোমরা এড়িয়ে যাওনি। কি নিদারুণ অচিন্ত্যনীয়ভাবেই না তোমাদের শত্রুদের প্রতি তোমরা করুণা দেখিয়েছিলে! মঁসিয়ে রাস্তল ভার্সাইতে বসে একথা শুনে কি মজাই না পাচ্ছিলেন যে তোমরা তার ফিরে আসার অপেক্ষায় দিন গুণছিলে এবং সেই ওয়ার্কশপের

ক্ষতিপূরণও তোমরা তাকে দিতে যা' তোমরা নিজেরাই তাকে তৈরী করে দিয়েছিলে! তোমরা, সেই বীরেরা, যারা শ্রমিকশ্রেণীর জন্য সর্বপ্রথম ক্ষমতা দখল করেছিলে, তোমরা তোমাদের করুণাভরা হৃদয়ের জন্য এ কথাটা ভুলে গিয়েছিলে যে শ্রেণীশত্রুকে শুধুমাত্র পরাজিত করাটাই যথেষ্ট নয়, শ্রেণী হিসাবে তাদের একেবারে নিকেশ করে দেওয়াটা আরও বেশী জরুরী।

এবং মঁসিয়ে রাস্তুল শেষ পর্যন্ত ফিরেও এসেছিলেন।

তোমাদের ভুল থেকে আমরা শিক্ষা নিয়েছি। তোমরা যেখানে একতরফাভাবে শান্তির সূচনা করেছিলে, আমরা লড়াইটা সেখান থেকেই শুরু করেছি এবং চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। মোরোজোভ্, বের্ক অথবা মিখাইলভ্, এদের কারুরই ফিরে আসার জন্য দিন গোণার ব্যাপারটা এমনভাবে কখনই আমাদের মাথায় আসেনি। আমাদেরই শ্রমে গড়া তাদের কারখানা আমরা নিয়ে নিয়েছি আর জীবনের পুরোনো পথে ফিরে আসার সমস্ত প্রত্যাশাই আমরা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি।

কমরেড পেচার্ড, যদি তুমি এখানে আসতে, তাহলে তুমি দেখতে পেতে কি বিপুল সাফল্যই না অর্জন করেছি আমরা!

যখন মিখাইলভ্‌কে তার কারখানা থেকে আমরা তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, তখন ওয়ার্কশপ্‌গুলোকে প্রাণহীন বিক্ত মনে হচ্ছিল। সেগুলোকে আমরা তখনই সজীব প্রাণময় করে তুলতে পারিনি। আমাদের চলে যেতে হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে, আব তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়ে যেতে হচ্ছিল যারা তাদেরকেই ফিরিয়ে আনবার জন্য পথ প্রস্তুত করতে চাইছিল, তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছিল যাদেরকে তোমাদের মঁসিয়ে রাস্তুল পাঠিয়েছিলেন তাঁর নিজের সাহায্যের জন্য। আমরা সেই সব শত্রুদের বিদায় করে দিয়েছিলাম এবং তারপরেই আমরা কাজ করতে শুরু করলাম। যখন এক নম্বর ওয়ার্কশপের প্রথম মেশিনটা চালু হোল আর যখন প্রথম সন্ধ্যাতেই এক বিজয়ী শোভাযাত্রার মত করে পঞ্চাশ-ষাট জোড়া জুতোকে পর পর আমরা সাজিয়ে দিয়েছিলাম, তখন ছোট্ট বাচ্চাদের মত আনন্দের আতিশয্যে হাস্যোচ্ছল হয়ে উঠেছিলাম আমরা। তুমি, শ্রমিক পেচার্ড, রাস্তুলকে বাদ না দিয়েই কাজ করতে চেয়েছিলে ; তুমি বুঝতে পারবে না স্বাধীনভাবে কাজ করার মধ্যে কি আনন্দই না রয়েছে, যেখানে তুমি একই সঙ্গে শ্রমিক ও তত্ত্বাবধায়ক।

তারপর থেকেই আমরা বাড়তে শুরু করলাম। একটার পর একটা ওয়ার্কশপ্ আমরা খুলতে থাকলাম, যেগুলো মিখাইলভ্ অনেককাল আগেই বন্ধ

করে দিয়েছিল। অনেক নতুন নতুন মেশিন আমরা বানালাম। নতুন শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিলাম আমরা। অনেক ধরণের পণ্যও উৎপন্ন করলাম আমরা এবং আজ, আমি, 'প্যারী কমিউন' নামের মস্কোর এক কারখানার একজন শ্রমিক হিসাবে প্যারীর কমিউনার্ডদের কাছে আমাদের কারখানার একটা রিপোর্ট দাখিল করছি ঃ

তিরিশ বছর আগে আমরা মাত্র ষাট্ জন এখানে এসেছিলাম। বর্তমানে কারখানায় আমরা রয়েছি পাঁচ হাজার জন।

তখন প্রতিদিন আমরা প্রস্তুত করতাম পঞ্চাশ থেকে ষাট্ জোড়া জুতো। আজকে আমরা তৈরী করি আঠারো হাজার।

তখন আমরা অনেকেই পড়তে বা লিখতে পারতাম না। আজকে আমরা অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছি।

আমাদের নিজেদের ক্লাব রয়েছে, আর তাই কাজের ফাঁকের সময়টাতে গির্জায় গিয়ে আমাদের সাময়িক নিষ্কৃতি খুঁজতে হয় না, যা' কমিউনের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোতেও তোমাদের করতে হোত। আমাদের নিজেদের রয়েছে লাইব্রেরী, রয়েছে পত্র-পত্রিকা, বিরাট খামার, সবজী বাজার, কারখানা-ক্যান্টিন।

আমাদের নিজেদের রয়েছে শ্রমিক-প্রযুক্তিবিদ্, রয়েছে শ্রমিক-নিয়ামক।

আমাদের নিজেদের রয়েছে এই বিশাল কারখানা, যা' এখনও বহন করে চলেছে তোমাদের কমিউনের নাম।

আমরা, শ্রমিকরা, এর তত্ত্বাবধায়করা ···

কমরেড, আমার এই চিঠি লেখার কোন মানেই হয় না। এটা তোমার কাছে কোন দিনই পৌঁছবে না, কারণ তুমি অনেকদিন আগেই মৃত্যুতে নিঃশেষ হয়ে গেছ। ভার্সাই-এর লুক্সেমবার্গ গার্ডেনে তুমি তাদের হাতেই নিহত হয়েছিলে আর তারা যখন তোমাকে মৃত্যুমঞ্চে টেনে নিয়ে চলেছিল তখন তোমার দেহে থুথু ছিটাতে শ্রীমতী রাস্তুল যথাসময়েই সেখানে এসে পৌঁছেছিলেন।

তোমরা ছিলে বোকা, বুদ্ধু! কমরেড পেচার্ড, তোমরা যারা মৃত, তাদের উদ্দেশ্যে আমি এ চিঠি লিখছি না, এ চিঠি লিখছি তাদেরই উদ্দেশ্যে যারা এখনও বেঁচে আছে। এ চিঠি লিখছি, তোমাদের ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীদের উদ্দেশ্যে যারা একথা ভেবে গর্ববোধ করে থাকে যে তাদের পিতা ও পিতামহরা ছিল কমিউনার্ড। এ চিঠি লিখছি তাদেরই উদ্দেশ্যে যারা একথা ভেবে গর্ববোধ করে থাকে যে তারা হোল প্যারী কমিউনের যোদ্ধাদের শ্রেণীভ্রাতা। আর তাদের কাছেই আমাদের এই কারখানার রিপোর্ট আমি দাখিল করছি ; যাতে করে তারা জানতে পারে যে, যা' কিছুর জন্য তোমাদের ছিল অনেক প্রতীক্ষা তা' বাস্তবে সম্ভব ; যাতে করে তারা

জানতে পারে যে বাহাত্তর দিন অস্তিত্বের পর যে প্যারী কমিউনকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা' আবার বেঁচে উঠেছে, বেঁচে উঠেছে আমাদেরই এই দেশে এবং এখনও বেঁচেই রয়েছে এবং এমন কোন শক্তি নেই যা' একে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে পারে ; যাতে করে তারা জানতে পারে যে আমরা সোভিয়েত শ্রমিকরা তোমাদের কাজকেই এগিয়ে নিয়ে চলেছি ; যাতে করে তারা জানতে পারে যে, আমরা যারা বিজয় অর্জন করেছি তারা অনেক কিছুই শিখেছি তোমাদের কাছ থেকে যারা পরাজিত হয়েছিলে ; এবং যাতে করে তাদের নিজস্ব জিনিষ মনে করে আমাদের চিন্তাধারাকে অনুশীলন করতে পারে, তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধায়, তাদের পিতাদের প্রতি শ্রদ্ধায় যারা ছিলে আমাদের প্রথম শিক্ষক।

পিওতর মিখাইয়ালোভিচ্ কুস্তারেভ্
'প্যারী কমিউনের' শ্রমিক

কর্ণেল বোবুনোভ্ ও চন্দ্রগ্রহণ

"তোমাকে বলছি, শোন, কেমন করে আমি কালা-ই-খুম্ব পর্যন্ত টেলিগ্রাফের লাইন পেতেছিলাম।

"সেই গ্রীষ্মটা ছিল সত্যিই এক কঠিন সময়। তাসখন্দ ও তুর্কমেনীয় জুনেদ্ খান্ এ ওসিপভ্‌দের অভ্যুত্থান দমন করা হয়েছিল; কার্শে থেকে কাইশাম্ব ও ইব্রহিম বেক্ পর্যন্ত সামরিক অভিযান সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আমরা মনে করছিলাম বিদ্রোহ দমনের কাজ যখন সব শেষ হয়ে গেছে, তখন কিছুক্ষণ অন্ততঃ আমরা সূর্যলোকে নিজেদের টান টান করে মেলে ধরতে পারব এবং তারপর যে যা'র ঘরে ফিরে যেতে পারব, আর ঠিক তখনই খবর এলো যে দরওয়াজ্‌-এ অভ্যুত্থান শুরু হয়ে গেছে এবং কালা-ই-খুম্বে কাঁচা ইঁটের প্রাচীর ঘেরা আমাদের সামরিক ছাউনিটা নাকি চারদিক দিয়ে ঘেরাও হয়ে গেছে।

"সে কি! ডোরাকাটা উর্দিগায়ে আবার সেই শয়তানগুলো?

"সুতরাং সাহায্যের জন্য আমাদের যেতেই হোল। আমাদের বেশীরভাগ লোকই ছিল স্তেপ্‌-এর লোক, সমতলভূমির লোক। সেই সর্বপ্রথম পর্বতগুলোর দিকে আমরা তাকিয়েছিলাম আর আমাদের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল এক সশ্রদ্ধ অভিব্যক্তি। যদিও কালা-ই-খুম্বে যাবার রাস্তাটা মোটেই তাকিয়ে দেখবার মত সেরকম কিছু নয়; তবে এটাও ঠিক আমি কখনই বিশ্বাস করতে পারতাম না যে ঐ পথে লোক চলতে পারে। বিশাল গভীর খাদের ওপর দিয়ে পথটা যেন ঝুলে ছিল, কোথাও কোথাও অনেক নীচে নদীর ধারা, আর ওপরেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল সেই স্রোতধারার ভয়ানক গর্জন। গোটা জমিটাই বাঁকাচোরা উঁচুনীচু আর সকালে যখন তুষারের ঘন আবরণ ঢেকে রাখত সবটুকুকে, তখন ঘোড়ায় চড়ে চলতে চলতে মনে হোত অতল ঢালু পথ বেয়ে যেন আমরা কোন্ গভীরে বিরামহীনভাবে নেমে চলেছি। স্বাভাবিক কারণেই সেই ঢাল বেয়ে নেমে চলার মধ্যে আনন্দের কোন কিছুই ছিল না। একধারে উঁচু পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল আর অন্য ধারে সংকীর্ণ পথরেখা। কখনও কখনও ভয়ে চোখ বুজে ফেলতাম। আর যাই হোক ঘোড়ার

ইন্দ্রিয়তো বেশ সজাগ বলেই শুনেছিলাম ; তাই তাকেই এগিয়ে চলতে দিতাম, আমার তাকাবার দরকারটাই বা কি ছিল ! ...

"তখন প্রত্যেকটা ঘণ্টাই ছিল অত্যন্ত মূল্যবান, অথচ গিসুন আমাদের আটকে রাখল। গিসুন, একটা গিরিপথ। বারো হাজার ছ'শো ফুট উঁচুতে টাটকা তুষারের পুরু স্তর জমেছে, সেই তুষারে ঘোড়াগুলো ডুবে গেল, তুষারে তাদের সর্বাঙ্গ, প্রায় মাথা পর্যন্ত ডুবে গেল। আমি ভাবলাম সেখান থেকে যাওয়াই ভাল, আর ঠিক তখনই মনে পড়ল, তেমারলেন-এর দরজায় কাদার মধ্যে থেকে কিভাবেই না আমরা বন্দুক চালিয়েছিলাম !

"আমরা কোটগুলোকে গা থেকে খুলে ফেল্‌লাম ও সেই তুষারের ওপর ওগুলো বিছিয়ে দিলাম, আর তার ওপর দিয়েই ঘোড়াগুলো হেঁটে চলল গিরিপথের সর্বোচ্চ শিখর এবং তারপর নীচে অন্যদিকে।

"পরে অবশ্য দেখাবার মত কোটগুলোর আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

"প্রায় পুরো একটা দিনই এভাবে আমাদের আটকা পড়তে হোল, কিন্তু এ সত্ত্বেও সময়মতই আমরা এসে পৌঁছলাম। আর আমাদের সবাইকে মরতেও হোল না।

"আমরা কালা-ই-খুম্বে পৌঁছনোর আগেই বাসমাচেরা পালিয়ে গিয়েছিল। তবে আমরা কিন্তু তাদের পিছু নিলাম না। সময়টা তখন এমনই ছিল যে তারা তোমার দিকে গুলি ছুঁড়লেও তুমি তার প্রত্যুত্তর করতে পারতে না, তাহলে ভালর চেয়ে মন্দই বরঞ্চ তুমি বেশী করে ডেকে আনতে। যদিও তারা তোমারই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়ছিল এবং যদিও সংখ্যার দিক দিয়েও তারা কম ছিল না, তবুও সচেতন শত্রুদের চেয়ে তাদের অজ্ঞ বন্ধু মনে করাই তোমার দিক দিয়ে সঠিক কাজ ছিল। প্রয়োজন ছিল তাদেরকে বুঝিয়ে দেবার, তাদেরকে হত্যা করার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

"অবশ্যই আমরা তাদের নেতাকে খুঁজ্‌ছিলাম। তার নাম ছিল মাখমাদ্লো বেক্। অবশ্যই সে ছিল একজন বেক্। আবার বিপ্লবী কমিটির চেয়ারম্যানও ছিল সে। ঐ সময়ে তাদের কৌশলটাই ছিল ঐরকম, তারা সোভিয়েত-এর বিরুদ্ধে লড়ত না, উল্টে তারা নিজেদেরকে সোভিয়েত-এর নেতৃত্বেই স্থাপন করত। এটাই ছিল আরও সুবিধাজনক ও আরও কার্যকরী একটা ব্যবস্থা। আর তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ সেই সোভিয়েতগুলো ছিল কি ধরণের, যখন সেগুলোর পরিচালনায় থাকত ঐ সব লোকেরা, যেমন, কালা-ই-খুম্বে, বেক্‌রা অথবা গার্ম-এ মুসলমান ইসান্‌রা।

"নির্দেশমত আমাকে কালা-ই-খুম্বেই থেকে যেতে হোল। এখানেরই মত সেখানেও পাঞ্জা নদী আমাদের চারদিক দিয়েই বয়ে যেত আর এখানের মত সেখানেও অন্যদিকে ছিল আফগানিস্তান, শুধুমাত্র ওখানে পাহাড়গুলো ছিল অনেক কাছে, বলতে গেলে আমাদের প্রায় মাথার ওপরেই ছিল ওগুলো। আর সামনের রাস্তাটাও ছিল একই রকমের, যেরকম রাস্তা ধরে আমরা এসেছিলাম। আমরা যে সেখানে অলস হয়ে পড়েছিলাম, কোন দিক দিয়েই ঠিক তা' বলা যায় না ; তবে, এটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, আমি এক ধরণের নিঃসঙ্গতা অনুভব করতাম, এক ধরণের বিরক্তিকর একঘেয়েমি আমাকে ঘিরে থাকত ...

"... যদিও পরে, সেখানে এসে পৌঁছল পামিরের বসন্তকাল, আর অমন সুন্দর দৃশ্য আমি কখনও দেখিনি ...

"... আর সেই একঘেয়েমি কাটাতে একদিন আমি একটা জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পঞ্জিকার পাতা ওল্টাতে শুরু করলাম, যে পঞ্জিকাটা অনেকটা রহস্যজনকভাবেই আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছিল।

"তুমি হয়ত এ ব্যাপারে অনেক কিছুই জান, কিন্তু আমার কাছে! আমার কাছে ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম—যা' কিছুই আমি পড়তাম, মনে হোত আমি যেন একটা নতুন কিছু আবিষ্কার করে ফেল্‌লাম। বিপ্লব পর্যন্ত আমি ছিলাম এক কামারের সহকারী আর বিপ্লবের পর গৃহযুদ্ধের তাগিদে আমাকে যেতে হোল একটার পর একটা ফ্রন্টে...নক্ষত্রদের নিয়ে আমার কোন কারবারই ছিল না। আর হঠাৎ আমি পড়ে ফেল্‌লাম,—বেতেইগুয়েজ্‌ নাকি সূর্যের চেয়ে তিরিশ মিলিয়ন গুণ বড় অথবা আমরা নাকি এমন সব নক্ষত্রদের দেখতে পাই যাদের অস্তিত্ব হাজার হাজার বছর আগেই মুছে গেছে। শুরুতে আমি ঐসব ব্যাপারকে ঠিক হজম করতে পারতাম না—আমার কাছে ওগুলো খুবই কঠিন ব্যাপার বলেই মনে হোত। কিন্তু মাসের পর মাস শুধুমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঐ পঞ্জিকাটাই আমার কাছে পড়ে রইল—আর কাছে-পিঠে কোন বইপত্তরই ছিল না ...।

"সুতরাং আমি একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীই হয়ে গেলাম এবং পড়ার আর কিছুই থাকত না বলে নক্ষত্রগুলোকেই আমি অধ্যয়ন করতাম ...

"সেটা ছিল ১৯২৪। গ্রীষ্ম শেষ হবার আগেই একজন সংবাদবাহক আমার কাছে এক নির্দেশ বহন করে আনল : শীতের জন্য তৈরী হও এবং প্রধান লাইনের সঙ্গে সংযোগের জন্য বেশ কয়েক কিলোমিটার ব্যাপী একটা টেলিগ্রাফ লাইন পেতে ফেল।

"কথাটা শুনতে সহজ মনে হলেও কাজটা মোটেই অতটা সহজ ছিল না।

আঞ্চলিক অধিবাসীদের বিস্তৃত সহযোগিতা ছাড়া সেই নির্দেশকে কার্যকরী করা তো দূরের কথা, নির্দেশটা কার্যকরী করার কথা চিন্তা করাটাও ছিল একরকম অসম্ভব ব্যাপার···আর তাদের সাহায্য! সে ব্যাপারটা ছিল অত্যন্ত জটিল। আমরা, শ্রমিকরা বেশীরভাগই এসেছিলাম দেশের কেন্দ্রস্থল থেকে, আঞ্চলিক অধিবাসীদের মধ্য থেকে কোন ক্যাডারই ছিল না এবং ঐ ব্যাপারটাই আমাদের জেলাতে সোভিয়েতী-করণের কাজটাকে দারুণভাবে কঠিন করে তুলেছিল। রুশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সঞ্চিত ঘৃণার সবটুকুকেই মোল্লারা কাজে লাগিয়েছিল। মোল্লারা এটাই দেখতে চেষ্টা করত যে সব রুশরাই একই রকমের, তারা আসে শুধুমাত্র লুঠতরাজ করতে। আমরা ধৈর্যসহকারে তাদের সেই প্রচার-কার্যের দাঁত উপ্‌ড়ে দিয়েছিলাম এবং হয়ত কিছুটা আদিমভাবেই আমরা তা' করেছিলাম। অনেকটা সাধুসন্তদের মত বেশ আত্মপীড়ন ও আত্মবঞ্চনার মধ্যে দিয়েই আমরা জীবনধারণ করতাম। অধিবাসীদের ভালবাসা আমরা জয় করে নিয়েছিলাম, কারণ, আমরা তাদের কাছ থেকে কিছুই চাইতাম না। আর এক্ষুণি হঠাৎ চাইতে হবে এত সব—শস্য, একটু-আধ্‌টু নয় প্রচুর শস্য ; স্তম্ভ তৈরীর জন্য কাঠ, তাও এক-আধ টুকরো নয়, প্রচুর কাঠ, অনেক অনেক বৃক্ষ, আর যা' এখানে খুবই দুষ্প্রাপ্য। আর যাই হোক না কেন, কালা-ই-খুম্বের সেই কাঠ তো আমি কেটে সাফ্‌ করে দিতে পারি না, যা' সুনামের তুলনায় পরিমাণে খুবই কম।

"এই কঠিন সমস্যার সমাধানে দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ ডুবে রইলাম। যখনই শীতের ভাঁড়ারের কথা তাদের কাছে বলে ফেল্‌তাম তখনই তাদের চোখে-মুখে সন্দেহ ফুটে উঠতে দেখতাম। তাই শুধুমাত্র ঘুমের মধ্যেই টেলিগ্রাফের বিষয় নিয়ে আমাকে কথাবার্তা বলতে হোত।

"কিন্তু শীত ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসতে থাকল, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তুষারের বেষ্টনী আরও বেশী কাছে এগিয়ে আসতে থাকল,—এবং আমাদের কোন একটা কিছু করার দরকার হয়ে পড়ল।

"আর ঠিক তখনই একটা বুদ্ধি আমার মাথায় খেলে গেল।

"সতেরই অক্টোবরের সন্ধ্যায় গোটা জেলার লোকজনদের নিমন্ত্রণ করলাম। তারা এলো, এলো ঘোড়ায় চড়ে, ঈশাকে চড়ে, পায়ে হেঁটে। জেলার একজন মোল্লাও আসতে ভুল্‌ল না। ভাল করে গুণে আমি এটা দেখলাম।

"আমাদের সীমান্তরক্ষীরা অনেক দিনই এভাবে কাজ করেনি!

"ধানের শেষ থলিটা আমরা নিঃশেষ করে ফেলেছি, শেষ ভেড়াটাকে পর্যন্ত আমরা কেটে ফেলেছি ···

"আমরা পা গুটিয়ে বসেছিলাম—গোটা ছাউনির সবাই এবং পাঁচশ' দরওয়াজ্ পুরুষের সবাই ওভাবেই বসেছিল। সুন্দর পরিচ্ছন্ন সন্ধ্যা, বেশ ফুরফুরে তাজা ভাব, ঠাণ্ডার লেশমাত্র ছিল না। আমার মত একজন নাস্তিকের সঙ্গে এরা সহযোগিতা করতে এসেছে বলে আমি আল্লাকে বেশ উপহাসই করছিলাম। এরকম একটা সন্ধ্যার খুবই প্রয়োজন ছিল আমার কাছে।

"প্রথমে আমি একটুকরো প্লভ্ তুলে নিলাম এবং আমিই প্রথম খেতে শুরু করলাম। আমি জানতাম যে তারা আমার আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করবে না আবার এটাও জানতাম যে তারা আমার আতিথেয়তাকেও বি:াস করবে না। আর তা' খুবই স্বাভাবিক। তাই আমাকেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হোল।

"ঐ খাওয়া-দাওয়ার মাঝেই আমাদের দাবীটা আমাকে রাখতে হোল। সবকিছুই অত্যন্ত সংক্ষেপে এবং বলতে গেলে একেবারে মোদ্দা কথায় আমি বললাম। এত সহজে আমি সবকিছু বলে ফেললাম যে আমি নিজেই বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার বক্তৃতায় ফল হোল ··· !

"খাওয়া-দাওয়ার শব্দ ক্রমেই মিলিয়ে গেল। সবকিছুই দারুণ চুপ মেরে গেল। যখন আমার চারপাশে লোকজন থাকত, তখন নৈঃশব্দ আমি একদম পছন্দ করতাম না। তাই তখন সেই নৈঃশব্দকে এড়াতে আমি চিন্তা করলাম যে আমি যেন রয়েছি হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে ওরেনবুর্গের সেই কামারশালায়, যেখানে মালিক একটা গজানে প্রচণ্ড শব্দে হাতুরি পিটে চলেছে ; অথবা অন্ততঃপক্ষে আমি যেন রয়েছি সেই গিসার শৈলশিরায় যেখানে শব্দের প্রতিধ্বনি করে মেশিনগানগুলো খট্-খট্ শব্দে গুলি ছুঁড়ে চলেছে। কোনও ভাবেই নয়, কিছুতেই নৈঃশব্দ নয় ··· ।

"আর কিছুক্ষণ পরেই আমি যা' ভেবেছিলাম তাইই ঘটল। প্রথমে একজন, তারপর অন্যজন এবং তারপর একসঙ্গে দশজন বলে উঠল। তারা সবকিছুকেই প্রত্যাখান করে বসল—এতটুকুও শস্য নেই, উপত্যকায় কোন গাছ নেই, শৈলশিরায় উঁচু পথগুলো ইতিমধ্যেই তুষারে ঢাকা পড়েছে···ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এখন তুমি আগেভাগেই বলে দিতে পারবে, কোথা থেকে আসবে পরের 'না' টা। মোল্লারা যেখানে বসেছিল সেখান থেকেই তারা বলে উঠল। তবে মোল্লাটি নিজে নয়, যারা তার চারপাশে বসেছিল তারাই বলে উঠল। ব্যাপারটা যেমন হওয়া উচিত ছিল সেরকমই হোল।

"এবং তারপরেই উঠে এলো আসল কথাটা।

"কথাটা বলল সাদা দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ, যে আমার সঙ্গে একই বাটি থেকে আহার করছিল।

সে বল্‌ল, "তুমি কিছুতেই তোমার শার্টের কিনারায় সূর্যকে আড়াল করতে পারলে না, সত্যটা বেরিয়েই পড়েছে। বুদ্ধিমানেরা সত্যকে দেখে চোখ দিয়ে আর বোকারা দেখে তাদের পেছন দিয়ে। আমাকে বোঝাও তো দেখি, যারা তোমাদের আগে এখানে এসেছিল, তাদের থেকে তোমাদের পার্থক্যটা কোথায় ? তোমরা আমাদের পেটের রুটি কেড়ে নাও, কেড়ে নাও মাথার ওপর থেকে গাছের ছাওয়া। আমার দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গেছে আর মৃত্যু থেকে আমি ভয় পাইনা। এবার বলতো দেখি কমাণ্ডার, তুমি যা' চাইছ তা' পেতে তুমি আমাদের কি ভয় দেখাতে চাও ... ?"

"আমি উঠে দাঁড়ালাম। বসে থেকে আর আমি কথা বলে যেতে পারছিলাম না।

আমি বললাম, "পিতা, কে আপনাকে বলল যে আমি ভয় দেখাচ্ছি ? কে আপনাকে বলল যে আগে যারা এখানে এসেছিল তাদের থেকে আমাদের কোন পার্থক্যই নেই ? আপনার দাড়িতো পেকে সাদা হয়ে গেছে, আর এর মানে হোল আপনি হলেন যথেষ্টই জ্ঞানী। তাহলে আপনি একজন যুবকের চোখ দিয়েই বা সত্যটাকে দেখতে চাইছেন কেন ?

"আমি একটু বাড়িয়েই বলেছিলাম। ঐ বৃদ্ধকে উস্‌কে দিচ্ছিল আর একজন বৃদ্ধ, যা'কে দেখাচ্ছিল ধর্মগুরুর মত, আর তার গালেতে ছিল এক প্রাচুর্যময় দাড়ির আবরণ। প্রথম বৃদ্ধটিকে দেখাচ্ছিল অনেক বেশী তরুণ এবং দ্বিতীয় বৃদ্ধটি তাকে পুত্র বলেই সম্বোধন করছিল। সুতরাং তাকে যুবক বলায়, আমার দিক থেকে বেশ মাঝারি ধরণের এক আক্রমণের মত ব্যাপারটা তার কাছে ঠেকেছিল। আর ইচ্ছা করেই শুরুটা আমি এভাবেই করলাম। আসলে আমি মোল্লাদের ওভাবেই আক্রমণ করতে চেয়েছিলাম ; আর আমি করলামও তাই। দরওয়াজদের প্রয়োজন, আমাদের কাজকর্ম, ধর্মগুরুর নির্দেশ এইসব নানা বিষয়ে আমি অনেক কথাই বললাম। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনাও আমি করলাম। তাদের বললাম, কালা-ই-খুম্বে কতকিছুই না বদলে গেছে—প্রথম ক্লাব গড়ে উঠেছে আক্‌সাকাল্‌রা সভাগুলোতে বেশ খোলাখুলিভাবে মেলামেশা করতে পারছে, এই প্রথম একজন শিক্ষক এখানে এসেছে (যদিও এটাও সত্য যে ছ'মাস যেতে না যেতেই কিস্‌লাকের বাইরে গলাকাটা অবস্থায় তাকে পাওয়া গিয়েছিল), জীবন বদ্‌লাতে শুরু করেছে, আগের চেয়ে তা' অনেক ভাল অনেক মুক্ত হতে শুরু করেছে। তবুও বলতে গেলে প্রয়োজনের তুলনায় এসব এমন কিছুই নয়, খুবই সামান্য, আর তার কারণ সব কিছুকেই বাঁধা দেওয়া হচ্ছে আর তারাই বাঁধা দিচ্ছে যারা সবাইকে যত রাজ্যের কু-

পরামর্শ দিয়ে বেড়াচ্ছে এবং অন্যের মূর্খামির ওপর নির্ভর করেই নিজেরা টিঁকে থাকতে চাইছে।

"আমরা, বলশেভিকরা, তোমাদের মোল্লাদের চেয়ে অনেক ভাল অনেক বেশী বুদ্ধিমান ...", এই কথাগুলো বলে আমি শেষ করলাম।

আবার সব নিশ্চুপ।

"এবার কিন্তু তাদের চুপ হয়ে থাকার ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারলাম। তারা সম্ভবতঃ পরিহাস করতে থাকল। আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম, তাতে ন'টা বেজে সাইত্রিশ্ মিনিট। এটাই সঠিক সময়। আর যতটা সম্ভব আনমনার ভান করে বলে ফেললাম, "তোমাদের মোল্লারা কি জানে যে আজ রাতেই চাঁদ আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে ... ?

"জলে ঢিল পড়লে যেমন হয়, পাঁচশ' দরওয়াজ পুরুষ সেভাবেই নড়ে উঠল। একটা মৃদু ফিস্ফিসানি আমার কথার প্রতিধ্বনিকে ঐ চত্বরের প্রান্ত পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেল, আবার ফিরিয়ে আনল। পাঁচশ' মাথা একবার পূর্ণচন্দ্রের দিকে ফিরল আবার পরক্ষণেই ক্রোধের চাহনি চোখে নিয়ে আমার দিকে ফিরল। কেউ কেউ চলে যাবার জন্য উঠে পড়ল, আবার কেউ কেউ অনেক কাছে সরে এলো।

"তুমি মিথ্যে বলছ!" সেই মোল্লাটি যাকে আমি যুবক বলে অপমান করেছিলাম, সেই বলল কথাগুলো।

"আমি হাসতে থাকলাম।

"আর মাত্র বারো মিনিট বাদেই চাঁদে গ্রহণ লাগবে। তোমরা এটাও জান না? তাহলে, কিভাবে দরওয়াজ পুরুষদের ন্যায়ের পথে তোমরা নেতৃত্ব দেবে?"

"তুমি মিথ্যে বলছ", ঐ মোল্লাটি আবার বলে ফেলল। আর খুব চিৎকারে আমি মিনিটে মিনিটে উত্তর দিতে থাকলাম।

"আর এগার, আর দশ, আর মাত্র পাঁচ মিনিট।"

"সবাই উঠে পড়েছিল আর সবাই সেই পূর্ণচন্দ্রের দিকে এবং তাদের কমরেড-দের মুখের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতটা পড়ে নিতে চাইছিল ...

"ন'টা বেজে ছাপান্ন।"

"এখনই"

"আমি আমার চাঁদ সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম। দরওয়াজ পুরুষদের চোখে গ্রহণ নিরীক্ষণ করছিলাম। সেখানে ত্রাস ও অল্প কৌতূহল। ক্রমে কৌতূহলকে তারা কাটিয়ে উঠল এবং শেষ পর্যন্ত ত্রাসের সবটাই মিলিয়ে গেল।

ঠিক কতক্ষণ তারা এভাবে নিশ্চুপ হয়ে থেকেছিল আমি তা' হিসাব করিনি এবং সবশেষে আশ্চর্য চোখে আমি চাঁদের দিকে তাকালাম।

"ওপরে আকাশে ভেসে চলেছিল খুশীতে উজ্জ্বল চাঁদ, বিরাট পরিষ্কার চাঁদ এবং চেয়ে আছে নীচের দিকে পরিহাসের ভঙ্গীতে।

"চত্বরের দিকে তাকালাম। তির্যক হাসির কলরোল চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ধরল। প্রচণ্ড হাসি চাপতে গিয়ে এমনকি আমাদের লালফৌজের ছেলেরা পর্যন্ত নির্লজ্জ বোকা বোকা মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"খুউব হয়েছে", সেই দাড়িওয়ালা যুবকটি বেশ বড়াইয়ের ভঙ্গীতে বলল কথাটা।

"আর ঐ কথাটাই পাঁচশ' জনের হাসিকে একেবারে মুক্ত করে দিল। আনন্দের হাসি, বিজয়ের হাসি। গোটা কালা-ই-খুম্বের সবাই শুনল সেই হাসি। পরাজয়ের তিক্ততা মুহূর্তেই আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, আত্ম-পরিতৃপ্তির সেই নিদারুণ সংকোচন আমাকে চত্বর থেকে বিতাড়িত করল।

"ছুটে আমার ঘরে এসে ঢুকলাম। ক্ষোভে সেই জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পঞ্জিকার পাতা ওল্টাতে থাকলাম। হ্যাঁ, সবই তো ঠিক রয়েছে ঃ

"চন্দ্রগ্রহণ"

"সতেরই অক্টোবর"

"ন'টা ছাপান্নর সময়"

"সালটার দিকে তাকালাম।

"হ্যাঁ, ঠিকই, উনিশশো চব্বিশ।

"আমি গভীরভাবে হতাশ হয়ে পড়লাম, দারুণ অখুশী হলাম, মরিয়া হয়ে উঠলাম। হায়! জ্যোতির্বিজ্ঞানটা বুঝি এরকমই! খালি ভাঁওতাবাজি, আর এরই নাম বিজ্ঞান! আমার আগেই এটা জানা উচিত ছিল। বেতেইগুয়েজ্ কেমন করে সূর্যের চেয়ে তিরিশ মিলিয়ন গুণ বড় হতে পারে? আর যেসব নক্ষত্রের অস্তিত্বই নেই তাদের আবার আমরা দেখিই বা কেমন করে? সেই লোকগুলোই বা কারা, যারা এসব বার করেছে আর গণনা করেছে? সব বুর্জোয়া আহম্মকের দল, এখনও ঘাপ্‌টি মেরে বসে রয়েছে আর আমাদের এসব বিশ্বাস করতে বলছে ···

"কিন্তু, কোণেতে, ঠিক কোণেতেই যে লেখা রয়েছে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিজ্ঞান পরিষদ্। আরে, তাহলে ব্যাপারটা কিরকম হোল? এ যে সোভিয়েতের বিজ্ঞান পরিষদ্! তাহলে? এটা তো কখনই হ'তে পারে না যে

সোভিয়েতের বিজ্ঞান পরিষদ্ মিথ্যা বলছে। কিন্তু, তাহলে চাঁদটা…তাহলে সেটাই বা আমাদের বিজ্ঞান পরিষদের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পঞ্জিকা মেনে চলছে না কেন ?

"হয়ত—ঘড়িটা ! হয়ত, আমার ঘড়িটাই ভুল। ঘড়িটা নিশ্চয়ই ঠিক সময় রাখতে পারছে না এবং চন্দ্রগ্রহণ নিশ্চয়ই ঘটবে · কিন্তু, না, আধ ঘণ্টা তো হয়েই গেল …

" · তাহলেও নিশ্চয়ই ঘড়িটাই। শেষ পর্যন্ত, না ঘড়িটা নয়, আমি নিজেই ভুল করছিলাম …

"আর যখন এটা আমি বুঝতে পারলাম, যেমনভাবে পালিয়ে এসেছিলাম, সেভাবেই ছুটে চলে গেলাম সেই চত্বরে।

"আমি বললাম, বন্ধুগণ, আমি একটা ভুল করেছি, তিন ঘণ্টার মত সময়ের আমি ভুল করেছি …

"তারা আমাকে সহাস্য সম্ভাষণ জানাল, যা' আমার কাছে একটুকুও অমৈত্রীসুলভ বলে মনে হোল না। আমার কর্তৃত্ব আমি হারিয়েছিলাম, তাই আমার কাছ থেকে ভয় পাবার মত কোন কারণই যেমন তাদের ছিল না, সেরকমই আমাকে ঘৃণা করার কোন প্রয়োজনও তাদেব ছিল না। আমি তাদেব কাছে একটা মজার সামগ্রী হয়ে পড়েছিলাম।

"আমার ভুলটা আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম।

"· তিন ঘণ্টা· মস্কোর সময় আর আমাদের সময়ের মধ্যে ঐ তিন ঘণ্টার ফারাক…এখন এখানে রাত্রি অথচ ঠিক এই সময়ে মস্কোতে সবেমাত্র সূর্যাস্ত হচ্ছে। আমি এটাই ভুলে গিয়েছিলাম আর এটাকেই আমি এখন ঠিক করে নিচ্ছি চন্দ্রগ্রহণ হবে বারোটা ছাপান্নতে·· ।

"শুধুমাত্র মজা করার জন্যই তারা আমার কথাগুলো শুনল। সেই সন্ধ্যাটা তাদের কাছে ছিল এক পরিতৃপ্তির সন্ধ্যা। তারা খুশী ছিল এজন্য যে, যে ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল, আসলে তা' আর ফলেনি ; তারা খুশী ছিল, কারণ, আমি হেরে গিয়েছিলাম, আর শস্য অথবা কোন কিছুই আর তাদের দেবার দরকার ছিল না। তাই তারা সবাই ছিল খুব খুশী। কোনও অভিযোগ না করেই আমার আমন্ত্রণে তারা আরও তিনটে ঘণ্টা বসে থাকতে রাজী হয়ে গেল।

"সেই অতি-সতর্ক মোল্লারাই শুধুমাত্র এতে কোন ফাঁদের গন্ধ পেল এবং তাই তাদের রক্ষীদের কিস্‌লাকে পাঠিয়ে দিল।

"বোকা, সব বোকা! আমি কোন ফাঁদই পাতিনি। আমি এর চেয়েও ভাল কিছুর আয়োজন করেছি। আমি চন্দ্রগ্রহণের আয়োজন করেছি।

"খুশীতে উচ্ছ্বল সেইসব বসে থাকা লোকজনদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল চাঁদের জ্যোৎস্না; আগুন জ্বলছিল চত্বরে; দোতারাগুলোর তারে ঝংকৃত হচ্ছিল সুরের মূর্ছনা আর দরওয়াজের পাহাড়ী মানুষেরা গাইছিল তাদের গান, দীর্ঘরেশের সঙ্গীত···আর একবারের জন্য আর একটা সুন্দর সন্ধ্যা ···

"কিন্তু মাঝরাতের পরেই ঐ দোতারাগুলোর ঝংকার আর গানের সুরের মূর্ছনা সবই যেন কোথায় হারিয়ে গেল, সেই সাদাসিধে হাসির কলরোল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাক। জমাট বাঁধা নৈঃশব্দে নিথর হয়ে গেল এবং ক্রমেই বেশী বেশী করে মাথা চাঁদের দিকে ফিরল, আর আমার কণ্ঠস্বর সেই নিস্তব্ধতা চিড়ে সেই চত্বরের মাটির দেওয়াল পেরিয়ে দূরে অনেক দূরে ধ্বনিত হতে থাকল।

"আর মাত্র দু' মিনিট ···"

"···জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পঞ্জিকাটা সঠিকই ছিল। আমি নিজেই ঠিকমত গুণতে ভুলে গিয়েছিলাম এবং হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে থাকলাম যেন কোন্ অদৃশ্য খাদক চাঁদের রুটিতে কামড় বসাতে থাকল আর লোভী ক্ষুধার এক এক কামড়ে চাঁদটাকে একটু একটু করে গিলে ফেলতে থাকল।

"আমি নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে রইলাম। কি ঘটতে পারে তা' জানে না এমন একজন মানুষের দুর্লভ এক অনুভূতি আমাকে ছুঁয়ে রইল আর মনে হোল গোটা চত্বরটাই যেন পাথরখোদাইকারীর এক ওয়ার্কশপে পরিণত হয়েছে। সেখানে সাজানো রয়েছে সবেমাত্র খোদাই করা পাথরে তৈরী পাঁচশ' নিথর মূর্ত্তি।

"একের পর এক সেই মূর্ত্তিগুলো যেন জীবন ফিরে পেতে থাকল এবং হঠাৎ তারা সবাই ঘুরে আমার দিকে তাকাল ···

'শয়তান', ক্রোধে সেই দাড়িওয়ালা মোল্লাটি চিৎকার করে উঠল, "যাদুকর! আমাদের চাঁদ ফিরিয়ে দাও ··· !"

"ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য গোটা চত্বরটা মুখিয়েই ছিল আর আকাশে তখনও চাঁদের অনেকখানিই বাকী ছিল, যা দিয়েই সে ঝল্সে দিচ্ছিল দরওয়াজদের হাতে ধরা অপ্রত্যাশিত ছুরিগুলোকে।

"আর আমি যদি যাদুকরই হয়ে থাকি", কথাগুলো সেই মোল্লাকে খুব দ্রুতই আমি বলে ফেললাম, "তাহলে এই মুহূর্তেই আপনাকে আমি কালো অন্ধকার করে দিতে পারি।"

"মরিয়া হয়ে সে তার মুখ ঢেকে ফেলল। তার মনে হোল সে বোধহয়

সত্যই কালো হয়ে যাচ্ছে। ত্রাসের চোখে সবাই তার দিকে তাকাল। আর যখন মুখ থেকে তার হাত নেমে এলো, চারদিকে তাকিয়ে সে দেখল চোখগুলোতে ভরা নিরানন্দের ছায়া ও সাহায্যের জন্য মরিয়া আবেদন। সেই মোল্লাটিকে এতই হাস্যম্পদ মনে হচ্ছিল যে তা' আর প্রকাশ করা যায় না; সত্যই তাকে দারুণ হাস্যম্পদ মনে হচ্ছিল কারণ,…সে এতটুকুও কাল হয়ে যায়নি।

"এটা আমার খুবই অদ্ভুত মনে হয় যে লোকজনরা কেন অযথা এত ভীত হয়ে পড়ে, আর কেনই বা তারা এভাবে নিজেদেরকে মজার খোরাকে পরিণত করে।

"আর পামিরের পার্বত্য অধিবাসীরা মজা করার ব্যাপারে দারুণ রকম অনুভূতিসম্পন্ন ছিল।

"আর এখান থেকেই আমার জয়যাত্রা শুরু হোল। চন্দ্রগ্রহণ আর মোল্লাটির অপমানিত হওয়ার মধ্য দিয়েই শুরু হোল সেই জয়যাত্রা।

"মহাজগৎ সম্পর্কে বেশ একটা বড় রকমের ব্যাখ্যা আমি রাখলাম। চন্দ্রগ্রহণের সমাপ্তি ঘোষণা করলাম। চাঁদ সম্পর্কে এমনভাবেই আমি কথাগুলো বললাম, যে মনে হচ্ছিল আমি যেন চাঁদেই জীবনের অর্ধেকটা কাটিয়ে এসেছি। আর লালফৌজের রাজনৈতিক প্রশিক্ষকের সহায়তায়, সৌরজগৎটা কিরকম তাও আমি তাদের বুঝিয়ে দিলাম—প্রশিক্ষকটি হোল সূর্য, আমি নিজে হলাম পৃথিবী এবং সবশেষে লালফৌজের ছেঁড়া কোট গায়ে চড়িয়ে একজন চাঁদ হয়ে আমাদের চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকল; আর তাদের সহাস্য অনুপ্রেরণায় ছায়াপথকে নক্ষত্রাকৃতির একটা রোলের সঙ্গে তুলনা করে তাদের আমি বুঝিয়ে দিলাম। তাছাড়া আলোকবর্ষ বিষয়েও অনেক কথা তাদের আমি শোনালাম, যদিও আমার এখনও সন্দেহ রয়েছে, সম্ভবতঃ ট্রিলিয়ন ও মিলিয়নকে আমি গুলিয়ে ফেলেছিলাম… তবে, রক্ষে যে সেটা কোন প্রয়োজনীয় ব্যাপার ছিল না, কারণ কোন দিক দিয়েই আলোকবর্ষ ব্যাপারটা আমাদের কাছে কোন কাজের ব্যাপার ছিল না। ঐ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পঞ্জিকায় যত সংখ্যা ও হিসেব-নিকেশ ছিল, তার সবটাই আমার মনে ছিল, আর সেগুলোরই সেখানে আমি পুনরুল্লেখ করলাম। আর তা' নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল না, শুধুমাত্র এটাই তাদের আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম যে লোকজনরা আগে থেকেই এসব জানে।

"যেহেতু আমার জ্ঞানের সীমিত পরিধিতে মহাজগৎ ক্রমেই যখন সংক্ষিপ্ত হয়ে এলো তখন আমি পৃথিবীতে ফিরে এলাম। পৃথিবী সম্পর্কে আমি নিজে যা' জানতাম সবটাই বলে ফেললাম—বললাম সীমাহীন স্তেপের কথা, বললাম কলকারখানার কথা, মহাসাগর ও তার বুকে ভেসে চলা জাহাজের কথা, আর

সেইসব আবিষ্কারের কথা, যেমন মোটরগাড়ী, উড়োজাহাজ ইত্যাদি, যেগুলোর কথা আমি কোথাও না কোথাও পড়েছিলাম।

"ওরেনবুর্গের একজন কামার হিসাবে, লালফৌজের ছোট্ট একটা দলীয় কমাণ্ডার হিসাবে, কালা-ই-খুম্বের সামরিক ছাউনির একজন হিসাবে বিশ্বের সমস্ত গৌরবময় কাহিনী আমি দরওয়াজ পুরুষদের কাছে নিবেদন করলাম এবং যে কেউউ তা' বুঝতে পারল।

"তারা আমাকে বুঝল। আমার সব কথাই শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনল। আর সেখান থেকেই এক প্রকৃত বন্ধুত্ব উৎসারিত হোল।

"ক্রমেই সেই শৈলশিরার আকাশে ফুটে উঠল ভোরের আলো। আর পুরোপুরি সকাল হবার আগেই আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেলাম। আকাশের নীলাচলে সেইসব বড় বড় পুষ্পক-রথের কথা তাদের আর আমায় বলতে হোল না, আমি বললাম খুবই সাধারণ সেইসব মালবাহী ওয়াগনের কথা যা'তে করে লোকজন বয়ে নিয়ে যায় শস্য ও ঘোড়ার জন্য খড়বিচালি। দুনিয়ার গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীগুলো আর কোন দূরের বস্তু হয়ে থাকল না। আমরা স্বপ্ন দেখতে থাকলাম, কেমন করে টেলিগ্রাফ এসব কিছুর কাছাকাছি আমাদের এনে দিচ্ছে।

"কালা-ই-খুম্ব পৃথিবীর একটা অংশ হয়ে উঠবে।

"টেলিগ্রাফ আমাদের সবকিছু বলে দেবে।

"এমনকি পরবর্তী চন্দ্রগ্রহণের কথাও জানিয়ে দেবে ···

"আর তুষারপাতের আগেই টেলিগ্রাফের তার পাতা হয়ে গিয়েছিল।

"১৯২৫-এর বসন্তে বাসমাচ্‌দের হঠাৎ হানা থেকে পর পর তিনবারই কালা-ই-খুম্বকে এই টেলিগ্রাফই বাঁচিয়ে দিয়েছিল ·· ।"

যখন ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভাঙ্গে

"মেট্রোরেলের দ্রুতগামী গাড়ীগুলো ধীরে ধীরে দুলছিল। আমার হাতে খোলা খবরের কাগজটাও দুলছিল ছন্দের তালে তালে। একজন অচেনা সহযাত্রী আমার ঠিক কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল আর বিড়বিড করে পড়ে চলেছিল খবরের কাগজখানা। হঠাৎ সে বলে উঠল:

"ওর মত আপনারও কি ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে না?"

তার প্রস্তাবটায় আমি কিছুটা আশ্চর্যই হয়ে গিয়েছিলাম। তাকে আমি সুনিশ্চিত করলাম যে আমার একটুকুও ঘুম পাইনি।

"আহা! তাহলে আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেননি!" কথাগুলো বলেই 'ইজ্‌ভেস্তিয়া'র একটা ছোট্ট অনুচ্ছেদের দিকে সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল।

খবরটা আমি পড়ে ফেললাম: "ঝিমিয়ে থাকার এক বিরল ঘটনা"—প্যাট্রিসিয়া ম্যাগুয়ের নামের এক আমেরিকান তরুণী ১৯৩২-এর ১৯শে জানুয়ারী নিউইয়র্কের একটা সাবওয়ে-ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়েছিল এবং ডাক্তারদের সবরকম চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে জাগানো যায়নি। তবে মনে হচ্ছে, এই সবেমাত্র বোধহয় সে জেগে উঠ্‌তে চলেছে ···

যখন সে দেখল, আমি খবরটা পড়ে ফেলেছি, তখন সে বলে উঠ্‌ল: "প্রায় তিনটে বছর! তবে এটা নয় হোল ঘুমের ব্যাপার; কিন্তু ঐ তিন বছরে ন্যু ইয়র্কের কত কিছুই না বদলে গেছে, তাই না? যখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন হয়ত তার বাবার কাজ ছিল, কিন্তু সে যখন জেগে উঠ্‌বে তখন হয়ত তার বাবার কাজ চলে গেছে, ময়দার দাম হয়ত আরও বেড়ে গেছে ··· এরকম কত কি নাই হয়েছে! আর এখানে যদি কেউ ওভাবে ঘুমিয়ে পড়ে এবং তিন বছর পরে জেগে ওঠে ·· কল্পনা কর কি আশ্চর্যই না সে হয়ে যাবে ···।"

সত্যিই কি দারুণ ব্যাপার, তাই না? মস্কোয় আজই যদি ঘুমিয়ে পড়া যায় আর তিন বছর বাদে জেগে ওঠা যায়! জেগে উঠেই দেখা যাবে সবকিছুই কি দারুণভাবেই না বদলে গেছে!

কিরভ্ স্টেশন আসতেই, সেই অদ্ভুত-মনা লোকটার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। স্বপ্নময় সেই পাতালপুরী থেকে এক দীর্ঘ চলমান সিঁড়ি আমাকে পৌঁছে দিল দিনের আলোয়। সামনে প্রসারিত কিরভ্ স্ট্রীট। খুব বেশী নয়, মাত্র দশ দিন আগেই ট্রামে চেপে আমি এই পথ দিয়েই গিয়েছিলাম। চলতে শুরু করতে না করতেই ট্রামটাকে বার বার থামতে হচ্ছিল, পথ আগলে দাঁড়াচ্ছিল মোটরকার, ঠেলাগাড়ী ও হাজার হাজার পথচারী। বোতলের মুখে ছিপি আটকে গেলে যেমন হয়, ট্রামটাও সেভাবেই পথে আটকে যাচ্ছিল, আর এটা ঘটছিল বেশ নিয়ম করেই।

আর আমি অবাক হয়ে দেখলাম, একি! বোতলের গলা থেকে ছিপিটাকে যে একেবারে বার করে নেওয়া হয়েছে। পথে কোন ট্রামই নেই, এমনকি এদের পথ-চিহ্নটুকু পর্যন্তও নেই। রাস্তাটা দারুণ রকম বদলে গেছে, অনেক চওড়া হয়েছে, আর বেশ খোলামেলা। তাজা এ্যাসফাল্টের রাস্তার ওপর দিয়ে চলেছে বাসের সারি। এ্যাসফাল্টে মোড়া রাস্তার দৈর্ঘ্য জুড়ে খাটানো হয়েছে ট্রলিবাসের তার, যা'তে করে ওগুলো জনসমুদ্র ও গাড়ীর ভীড়ে ক্রুজারের মত পাশ কাটিয়ে চলতে পারে।

মস্কোর মেট্রোরেলের সেই অচেনা নাগরিকটির কথা মনে পড়ল। যদি আমি দশ দিন আগে ঘুমিয়ে পড়তাম ও আজই যদি ঘুম থেকে জেগে উঠ্তাম এবং যদি মস্কোর পথরেখাগুলোর ওপর আলোকিত রাত্রি, সেগুলোর অপসারণ আর এ্যাসফাল্টের নতুন প্রলেপকে সমান করার কাজে নিযুক্ত কুড়িটা স্ট্রীট রোলারকে আমি না দেখে থাকতাম, তাহলে এখন কিরভ্ স্ট্রীটকে খুঁজে বার করার ব্যাপারটাই একটা ধাঁধার মত ঠেকত, একটা ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হত। আমি কিছুতেই কিরভ্ স্ট্রীটকে চিনতে পারতাম না। আর এটা মাত্র দশ দিনের ব্যাপার।

এক উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভের সামনে আমি থমকে দাঁড়ালাম, এই গাছ-গাছালিতে সাজানো প্রশস্ত রাজপথে যেটাকে আমি কখনও দেখিনি। আমার যতদূর মনে পড়ছে, চারমাস আগে কয়েকটা ছোট হেলে পড়া পুরোনো কুটীরকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম ; যখন নিরোর কায়দায় গোটা মস্কোকে জ্বালিয়ে দিয়ে সেই আলোয় অভ্যর্থনা করা হয়েছিল নেপোলিয়নকে তখন লোকজনরা সম্ভবতঃ সেই কুটীরগুলোকে পুড়িয়ে ফেলতে ভুলে গিয়েছিল। কাছাকাছি একদল লোক ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল এবং খুবই দ্রুত একটা উঁচু কাঠামোকে খাড়া করছিল। তারা বলেছিল, সেখানে নাকি একটা নতুন ইস্কুল তৈরী হবে এবং এখন সেটাই হয়েছে। আর তা' হয়েছে মাত্র চারমাসে। আর ঐ চারমাসে বাহাত্তরটা বিরাট

বিরাট বাড়ী মস্কোয় গড়ে উঠেছে। আহা! যদি আমি চারমাস আগে ঘুমিয়ে পড়তাম …।

কাছেই আর একটা উঁচু কাঠামো। তার ওপর উড়ছে একটা লাল নিশান এবং একটা বড় ফেস্টুন ঘোষণা করছে যে পরিকল্পনাটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ও যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গেই তারা নিষ্পন্ন করবে। আর সেই পরিকল্পনাটা ছিল বসতবাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা। ছ'মাসের মধ্যেই মস্কোতে একশ' চল্লিশটা বসতবাড়ী নির্মিত হবে এবং প্রত্যেকটা বাড়ীতে গড়ে চল্লিশ হাজার বর্গমিটার মেঝে থাকবে। আর তা' হবে মাত্র ছ'মাসের মধ্যে! আহা! আমি যদি ছ'মাসের জন্য ঘুমিয়ে থাকতে পারি!

ভোরোভ্ স্ট্রীটের ওপর অতিসুন্দর জমকালো আধুনিক এক প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। আমি এর আগে কখনও এই প্রাসাদটাকে দেখিনি। আমি শুধুমাত্র এর উঁচু কাঠামোটাই দেখেছিলাম। তাও প্রায় আট ন'মাস আগে। ভেস্‌নিন্ ভাইয়েরা সেখানে একটা নতুন রঙ্গালয় নির্মাণ করেছে। আর এক সপ্তাহের মধ্যেই এটাকে খুলে দেওয়া হবে। আর তাই যদি আমি …

সর্বত্রই এরা গড়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, কাঠামো খাড়া করছে, ভিত্ খুঁড়ছে। বলতে গেলে এখন পৃথিবীর মধ্যে বাড়ী-ঘর তৈরীর সবচেয়ে বড় অঞ্চলই হোল মস্কো। তবে একজন বিদেশী যদি ব্যাপারটা ঠিক মত বুঝতে না পারেন তবে তিনি অস্বস্তি বোধ করবেনই। খুপ্‌রী জানলাযুক্ত নীচু নীচু বাড়ী-ঘরে ভরা মস্কোর ভাঙাচোরা সংকীর্ণ রাস্তাগুলোতে যদি তিনি ঘুরে বেড়ান, তাহলে নিঃসন্দেহে ওগুলো তার মনে এক গভীর ছাপ ফেলবে এবং একধরণের অসহায়ের ভাব তার মধ্যে ফুটে উঠবেই। আর যখন তিনি এসব কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন তখন তিনি খোঁড়াখুঁড়ি করা রাস্তার এখানে ওখানে জমে থাকা কাদা-মাটির স্তূপের ওপর দিয়ে সেই ইঞ্জিনিয়ারটির মতই বেশ হাল্কা চালে লাফিয়ে লাফিয়ে চলবেন, যে ইঞ্জিনিয়ারটি এই কথা ভেবে কত খুশীই না হয়ে থাকে যে শীঘ্রই তার এ্যাসফাল্টের তাড়ায় ঐসব কাদা-মাটির চাঙ্‌রাগুলো রাস্তা থেকে বিদায় নেবে। আমি একথাই ভেবে থাকি যে আমরা সবাই এখানে হেঁটে চলে বেড়াই আর আমাদের অনুভূতিতে মিশে থাকে সেইসব রাজমিস্ত্রীদের গর্ব, যারা এই বিপুল নির্মাণকার্যের জন্য সত্য সত্যই গর্ববোধ করে থাকে, যা' মস্কোর মত এক বিরাট গ্রামকে এক সুন্দর শহরে বদলে দিচ্ছে। আর মস্কোর মেট্রোর সেই প্যাট্রিসিয়া ম্যাগুয়ের যদি এই নির্মাণকার্যের গোটা সময়টা ধরে ঘুমিয়েই কাটাত আর একটা নতুন শহরে যদি তার ঘুম ভাঙ্‌ত, তাহলে নির্ঘাত সে পথ হারিয়ে ফেলত … কিন্তু, না তাই বা হবে কেন?

একটা পরিকল্পনার ছক্ অনুসারেই মস্কো নির্মিত হচ্ছে। কল্পনা করার মত এটা কোন একটা ব্যাপারই নয়। ভবিষ্যত মস্কোর একটা পরিকল্পনার ছক্ যে কেউ মনের মধ্যে তৈরী করেই রাখতে পারে, যা'তে করে ঘুম থেকে জেগে উঠলে সে আর নতুন মস্কোয় হারিয়ে যাবে না।

এবার গোর্কী স্ট্রীটে আসা যাক। এটা একটা কেন্দ্রীয় রাস্তা এবং খুবই প্রয়োজনীয় রাস্তা। বর্তমানে রাস্তাটা কিন্তু বড়ই ঘিঞ্জি। খুবই সংকীর্ণ রাস্তা এটা, বিস্তার আঠারো-থেকে কুড়ি মিটারের মধ্যে। আর তিন বছরের মধ্যেই রাস্তাটা দ্বিগুণ চওড়া হয়ে যাবে। ওখত্‌নী রীয়াদ ও আর্টস্ থিয়েটারের রাস্তার মধ্যবর্তী অঞ্চলের ডানদিকের পুরোনো জীর্ণ ঘর-বাড়ীগুলোর দিকে একটু তাকিয়ে দেখ। তুমি বোধহয় এই প্রথম এগুলোকে দেখলে। এগুলোকে ভেঙ্গে ফেলা হবে, আর তাদের আগের চত্বরের বাইরে অনেক দূর ছাড়িয়ে নতুন বাড়ীগুলো গড়ে উঠবে। পরে রাস্তার বাঁ দিকের বাড়ীগুলোকেও বিদায় জানাতে হবে।

মস্কো সোভিয়েতের ঐতিহাসিক বাড়ীটাকেও কি বিদায় জানান হবে ?

না, না, তা' হবে কেন ? তিন বছর পরে তুমি ওটাকে আবার দেখতে পাবে, শুধুমাত্র একটু পিছিয়ে যাবে এই যা'—মাত্র কুড়ি মিটার। হাজার এক রাতের কাহিনীগুলোতে যেমন থাকে সেভাবেই বড় বড় দৈত্যদের মত এইসব অতিকায় ঐতিহাসিক স্থাপত্য কীর্তিগুলোকে শুধুমাত্রই স্থানান্তরিত করা হবে। সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়ার আর শ্রমিকরা হাজার হাজার রাত ধরে তাই করবে। চার্চের চূড়ায় আভ্‌তোদের গাড়ীর বিজ্ঞাপনযুক্ত বাড়ীগুলোসহ ধর্মবেত্তাদের জন্য পুশকিন স্কোয়ারে যে একের পর এক অনেকগুলো বাড়ী রয়েছে, যেগুলোকে স্রেফ তামাশার খোরাক হিসাবে বিপ্লবী মিচুরিনবাদীরা টিঁকিয়ে রেখেছিল, সেগুলোও সেখান থেকে অপসৃত হবে। তুমি এখন চলেছ বিশাল ভিক্টরী স্কোয়ার ধরে, চলেছ আরও বড় বাইলোরুশীয় স্টেডিয়াম ধরে, চলেছ একশ' কুড়ি মিটার প্রশস্ত লেনিনগ্রাদ রোড বরাবর, চলেছ নতুন বাড়ীগুলোর মধ্য দিয়ে পেত্রোভ্‌স্কোস্ত্রেশিনেভ্ ও সিলভার ফরেস্ট-এর অতিকায় জলের স্টেডিয়ামের দিকে ···।

তুমি চলেছ ট্রলিবাসে চেপে। না, না, তোমাকে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। মস্কোয় এখন রয়েছে মাত্র পঞ্চাশটা ট্রলিবাস, আর তিন বছর বাদে যখন তোমার ঘুম ভাঙ্‌বে, তখন সেখানে থাকবে হাজারটা ট্রলিবাস। তাছাড়া তুমি ট্রামে চেপেও যেতে পারতে। এই সময় বরঞ্চ তুমি ঘুমিয়েই থাক, আর শত শত কিলোমিটারের ট্রাম-লাইন পাতা হয়ে যাক।

তবে শুধুমাত্র গোর্কী স্ট্রীটই বদলে যাবে না। গোটা মস্কোটাই বদলে যাবে।

এমন কি মস্কো নদীও বদলে যাবে। তুমি কি এখন কোনভাবেই চিন্তা করতে পার সেই কাদামাখা মস্কো-নদীর তীরের কথা, যা ভরে থাকত মানুষের ও নানা জিনিষের পরিত্যক্ত সব আবর্জনায়? আজ এই নদীর ধার ঘেঁষে রয়েছে আঠারো কিলোমিটার ব্যাপী উজ্জ্বল গ্রানাইট পাথরের বাঁধানো পাড়। আর মস্কোর ধার ঘেঁষে যে ছিয়াশী কিলোমিটার নদীতীর রয়েছে তার সবটাই আগামী তিন বছরে গ্রানাইট পাথরে মুড়ে দেওয়া হবে।

তুমি দেখতে পাবে হাজার হাজার নতুন বাড়ী-ঘর। পুঁজিপতিদের রাজত্বের শেষ ষাট বছরে তারা তিরিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার স্থান মস্কোর লোকজনদের বসবাসের জন্য নির্মাণ করেছিল, আর আগামী তিন বছরেই নির্মিত হবে সমপরিমাণ বাসস্থান। আর যদি দশ বছর বাদে তোমার ঘুম ভাঙে তাহলে আজকের মস্কোয় যে একশ' পঞ্চাশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বসবাসের জায়গা রয়েছে, ঐ দশ বছরেই নির্মিত হবে সমপরিমাণ বাসস্থান। বলতে গেলে আগামী দশ বছরে আর একটা নতুন মস্কোই তৈরী হয়ে যাবে। অনেক সরকারী বাড়ীও নির্মিত হবে। আর সবার ওপর নির্মিত হবে অনেক ইস্কুল। শত শত শতাব্দীর অস্তিত্ব বুকে নিয়ে আজকের মস্কোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনশ' আটান্নটা ইস্কুল। তিন বছরে তৈরী হয়ে যাবে আরও তিনশ' নব্বইটা ইস্কুল।

ঘুমন্ত মানুষটির ঘুম ভাঙ্গার আগেই, তিন বছরেই এসব ঘটে যাবে।

কিন্তু, বলতো দেখি, তিন তিনটে বছরের এই রকম অত্যাশ্চর্য কাজকর্মের মধ্যে কে ঘুমিয়ে কাটাবে? রূপকথার গল্পে আছে, একজন লোক নাকি একটা গোটা দিন ঘুমিয়ে কাটিয়েছিল এবং সেই সময়ে মানুষের একটা গোটা যুগই নাকি কেটে গিয়েছিল, এই ব্যাপারটা আমার কাছে সব সময়েই দারুণ খারাপ লাগত। একটা মহান যুগ ধরে ঘুমিয়ে থাকাটা একজন মানুষের কাছে কি দারুণ একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার, তাই না?

তাই মেট্রো-রেলের সেই অচেনা নাগরিক, তোমাকে ধন্যবাদ! তোমার ঐ উদ্ভট প্রস্তাবটা আমি মেনে নিতে পারলাম না।

তৃতীয় অংশ

রঙ

প্রাগের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে বরফ-ভাঙা জাহাজ 'চেলুস্‌কিন'-এর ওপর তোলা একটা চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী চলছিল। সম্ভবতঃ ছবিটার শ'খানেক ফুটের মত দেখান হচ্ছিল। ছবির শিরোনামটা যখন পর্দায় ফুটে উঠল, তক্ষুণি দর্শকদের মধ্যে শোনা গেল একটা চাপা ফিস্‌ফিসানি আর তারপরেই দারুণ নিস্তব্ধতা। এভাবেই কয়েক মিনিট কেটে গেল। ছবিটা শেষ হোল। দর্শকরাও যে যার আসন ছেড়ে উঠে পড়ল, কিন্তু তারা মোটেই তৃপ্ত হোল না।

"খবরের কাগজগুলো যতটা রটিয়েছিল, আসলে তাদের অতটা দুর্যোগের মধ্যে পড়তে হয়নি।"

—হ্যাঁ, কথাটা সত্য। তবে প্রাগে যা' দেখান হচ্ছিল তা' ছিল ছবিটার প্রথম অংশ মাত্র, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, 'চেলুস্‌কিন'-এর বিরাট কাহিনীকে ঘিরে যে দলিল চিত্রটা তোলা হয়েছিল, তার অপেক্ষাকৃত ছোট অংশটাই দেখান হচ্ছিল। এতে সেই গল্পাংশটুকুই স্থান পেয়েছিল, যেখানে বরফের বাঁধা ডিঙিয়ে উত্তর সাগরের বুকের ওপর দিয়ে বেশ নিরাপদেই এগিয়ে চলেছিল 'চেলুস্‌কিন' এবং যেন এক স্বাভাবিক সমুদ্রযাত্রায় উত্তর সাগরের ওপর দিয়ে ভেসে চলতে চলতে করণীয় কাজগুলো করে চলেছিল 'চেলুস্‌কিন'। কিন্তু দ্বিতীয় অংশটা যখন দেখান হোল, তখন তারা দেখতে পেল, কিভাবে 'চেলুস্‌কিন' বিপর্যয়ের মধ্যে গিয়ে পড়ল ; সেই ভাসমান বরফের পাহাড়গুলোতে কিভাবে বেঁচে রইল 'চেলুস্‌কিন'-এর আরোহীরা এবং কিভাবেই বা তাদের উদ্ধার করা হোল, আর এতেও হয়ত কিছু দর্শক ঠিকমত তৃপ্তি পেল না। একটা জাহাজকে তারা ডুবতে দেখল ঠিকই, কিন্তু ঐ বিপর্যয়ের মুখে নারীদের হাত কচ্‌লাতে অথবা হতাশায় ভারাক্রান্ত পাণ্ডুর মুখে পুরুষদের লড়াই করে যেতে, তারা দেখল না ; পরিবর্তে তারা দেখল, শত শত শ্রমিক কাঠের প্যাকিং বাক্স, বস্তা আর মালপত্তর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে চলেছে ; আর সেটা তারা করছিল এত যত্নের সঙ্গে ও এত নিখুঁতভাবে যে মনে হচ্ছিল তারা যেন বন্দর সংলগ্ন কোন গুদামের কাজে ব্যস্ত রয়েছে। দর্শকের চোখের সামনে পর্দা জুড়ে ফুটে উঠল বরফের সুবিস্তীর্ণ প্রসার, আর তারই মধ্যে শুভ্রতা-ধোওয়া এক টুকরো অঞ্চলে কিছু হাস্যোচ্ছ্বল বালককে ফুটবল খেলতে দেখল তারা। যেমনভাবে শহরতলীর বালকেরা ফুটবল খেলে থাকে, সেভাবেই সহজ সাবলীল ভঙ্গীতে খেলে চলেছিল তারা। ফারের কোট গায়ে মহিলাদের হাসতে হাসতে বিমানে উঠতে দেখল তারা। প্রপেলার চালু হোল, বিমান আকাশে উড়ল এবং লায়াপিডিয়েভস্কির বীরত্বপূর্ণ বিমানযাত্রা বলতে এসবই পর্দায় ফুটে উঠল।

এখানে বীরত্বের ব্যাপারটা কোথায় ? অধ্যাপক স্মিদ্‌-এর চোখের ভ্রূযুগল কিংবা গোঁফ থেকে ঝুলে থাকা তুষারের সূতোগুলোর দিকে যদি তুমি তাকাও, তাহলে অবশ্যই তুমি এটা বুঝতে পারবে যে সাগরসৈকতে ছুটি কাটানোর চেয়ে ভাসমান বরফের পাহাড়ে ছুটি কাটানোর ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অনেক কম আনন্দদায়ক। তবে এটাও ঠিক যে, খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়ে যে ভয়াবহ দৃশ্যটা তুমি কল্পনা করেছিলে, তা' নিশ্চয়ই তুমি দেখতে পাওনি এবং সবচেয়ে

নাটকীয় সেই মুহূর্তগুলোও তোমার কাছে কত না শান্ত, কত না স্বাভাবিক, কত না সাধারণ মনে হয়েছে।

আর একেই বলে বীরত্ব !

আর এটা একটা আমেরিকান ছবি হ'লে, এই ব্যাপারটাকেই কত ভিন্নভাবে ও আরও কত আকর্ষণীয় করেই না দেখান হোত। ব্যাপারটা তখন এরকম হোত—ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়ে বিমানচালক বিমানটাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছেন আর হঠাৎ কোত্থেকে তার সামনে উঁচু হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াল বরফের স্তূপ। বৃদ্ধের চোখের মৃত্যুভয়ের মত মৃত্যু যেন পথ আগ্‌লে দাঁড়াল। বিমানচালকের চোখে ফুটে উঠল নৈরাশ্যের পাণ্ডুরতা। জ্বরে আক্রান্ত রুগীর মত অস্থির চাঞ্চল্যে কণ্ট্রোলগুলোকে চেপে ধরল সে আর আচম্‌কা ঘুরিয়ে দিল স্টিয়ারিঙ্‌ হুইলটাকে। ভয়ে মুহূর্তের মধ্যে তার সারা শরীর কাঁপতে থাকল, সেই শিহরণ তোমাকেও শিহরিত করল, আর কিভাবেই না তুমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে যখন সবকিছুই এক আনন্দময় পরিসমাপ্তিতে মিশে গেল। বিমানের তলা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই ভাসমান বরফের স্তূপ, আর কপালের ওপর জমে থাকা বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছতে মুছতে তৃপ্তি ও স্বস্তির এক নিবিড় অনুভূতি ভরিয়ে দিল সেই বিমানচালককে। দৃশ্যটা আরও আকর্ষণীয় হতে পারত যদি আরোহীদের দৃশ্যটাও দেখান হোত। তাহলে দেখা যেত, উত্তেজনায় তাদের শরীর কুঁচকে যাচ্ছে ; তারা মূর্ছা যাচ্ছে, কেবিনের কোণে ঢলে পড়ছে অথবা মৃত্যুর আগে শেষ আলিঙ্গনে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে। আর সেই বীর বিমানচালক যখন তাদের সেই নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে দিল, তখন সেই বীরকে কি মহানই না মনে হোল !

বিমানচালক কামানিনের অবস্থাটা ছিল সেরকমই—চারিদিকে কুয়াশার ঘন আস্তরণ, সামনে বরফের বিরাট বাঁধা। সেই মুহূর্তেই যদি তার কোন ছবি তোলা হোত, তাহলে তার চোখে যেমন কোন ভয় বা নৈরাশ্যের চিহ্নই দেখা যেত না, তেমনই জ্বরে আক্রান্ত রুগীর মত তার কোন ছট্‌ফটানিও তাতে ফুটে উঠত না। তাতে দেখা যেত, খুবই সতর্কতার চোখে বরফের বাঁধাগুলো থেকে তিনি দূরত্ব মেপে চলেছেন এবং তার হাতটা যেন যান্ত্রিকভাবেই জয়স্টিক্‌টাকে চেপে ধরে রয়েছে। একজন বীর না ভেবে তাকে তখন একজন ট্যাক্সিচালকের মতই মনে হোত, যে আরোহীদের অনুরোধে কখনও ডানদিকে কখনও বাঁ-দিকে বাঁক নিয়ে চলেছে। আর আরোহীদের যদি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যেত এবং চুপ করে বসে না থেকে বিমানটার ভারসাম্য নষ্ট করে দেওয়ার দিকেই বেশী

তৎপর হতে দেখা যেত, তাহলে সবকিছুই যে ভালভাবে শেষ হয়েছে তৃপ্তির সঙ্গে সেকথা বলার সেই সুযোগ আর তাদের থাকত না।

মনে হয়, বীর সম্বন্ধে যে সাধারণ ধারণা আমাদের আছে, তাতে একজন সত্যিকারের বীর মোটেই খাপ খায় না। কথাটা দারুণভাবেই সত্য। আর এরকমটা যে হয়ে থাকে তার কারণ সত্যিকারের বীরদের দেখে এই ধারণাগুলো কখনই আমাদের মধ্যে তৈরী হয় না, বরঞ্চ এমন একটা শ্রেণী থেকে এই ধারণাগুলো উৎসারিত হয়, যা'র নিজের কোন বীরই নেই এবং নিজের স্বার্থের তাগিদে তার নিজের পুরোনো দিনের বীরদেরও যে পুরোপুরি ভুলে গেছে। এই শ্রেণীটা বীর সম্পর্কে এই চল্‌তি ধারণাটা জনসাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই তৈরী করেছে কারণ এই শ্রেণীটা প্রকৃত বীরদের ভয় করে থাকে এবং নিজের স্বার্থেই প্রয়োজনমাফিক বীর সৃষ্টি করে থাকে। এরকম একটা সমাজে মানুষের জীবনের যারা সত্যিকারের রক্ষক তাদের বড়জোর একটু কৃতজ্ঞতা জানানো হয়, আর সামরিক জেনারেলদের দেওয়া হয়ে থাকে উচ্চ সম্মানের খেতাব।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও বীরত্ব ব্যাপারটা থেকেই গেছে। বীরত্ব কৃত্রিমভাবে তৈরী কোন ব্যাপার নয়; জীবনের এটা একটা বাস্তব সত্য। তাহলে বীরত্ব ব্যাপারটা কি? আর সত্যিকারের বীরই বা কে?

ধরা যাক, নদীর স্রোতে ডুবে যাচ্ছে একজন লোক। সে সাহায্য চাইছে। একদল লোক নদীর ধার ঘেঁষে ছুটোছুটি করতে থাকল আর এই বলে চেঁচাতে থাকল যে, কি ভয়ঙ্করই না অবস্থা আর কেনই বা কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসছে না। আর কেমন করেই বা লোকটির কাছে পৌঁছতে হবে, এই নিয়ে এমন কি তারা তর্কই জুড়ে দিল। এরই মধ্যে তাদের একজন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর নদীর স্রোত তাকে টেনে নিয়ে চলল। সে ব্যর্থ চেষ্টা চালাতে থাকল। ইতিমধ্যে একজন একটা নৌকার দিকে ছুটে গেল, নৌকার বাঁধন খুলে দিল এবং কোন বড় রকমের ঝুঁকি ছাড়াই অত্যন্ত সহজভাবে নিমজ্জমান মানুষটাকে উদ্ধার করল। যদি এরকম অবস্থায় কাউকে বীর হিসাবে বেছে নিতে হয়, তবে নৌকার ঐ লোকটিকেই আমাদের বেছে নিতে হবে কারণ সে যা' করেছে ঐ মুহূর্তে সেটাই আসলে করা দরকার ছিল। যদি নৌকার ঐ ধারণাটা তার না থাকত তবে কোনভাবেই সেই নিমজ্জমান ব্যক্তিটিকে বাঁচান যেত না। আর যদি তার ঐ নৌকার ধারণাটা না থাকত, তবে যে লোকটি স্রোতের বিরুদ্ধে ব্যর্থ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, সেই লোকটিই বীর বলে পরিগণিত হোত, যদিও তার প্রয়াস ও কার্যকলাপ নিমজ্জমান ব্যক্তিটির কোন সাহায্যেই লাগছিল না। সুতরাং সমগ্র পরিস্থিতির ওপর ব্যক্তিটির

নিয়ন্ত্রণ কতখানি, পরিস্থিতিটাকে কতখানি সতর্কতার সংগে সে উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং মজুত উপায়ের কতখানি সদ্ব্যবহার সে করতে পেরেছে, তার ওপরই এটা নির্ভর করে।

তাহলে আমরা একথাই বলতে পারি যে, সেই সুনির্দিষ্ট মুহূর্তে যা' করা উচিত যে তাই করে থাকে, সেই ব্যক্তিই বীর।

বীরত্বের রোমাণ্টিক ব্যাপারটা এভাবেই একটা খুবই বাস্তব ব্যাপারে পরিণত হয়। কিন্তু এসত্ত্বেও বোধহয় ব্যাপারটাকে ঠিকমত ব্যাখ্যা করা গেল না। একজন পুঁজিপতির কথা ভাবা যাক যে আবার নিজেই একটা কারখানার অংশীদার। ধরা যাক, অন্যান্য অংশীদারদের থেকে অনেক আগেই সে বুঝতে পারল যে কারখানাটা আশানুরূপ অর্ডার পাবে না, এবং যার ফলে শেয়ারের দামও কয়েক পয়েন্ট নেমে যাবে। ধরা যাক সে এটাও বুঝতে পারল যে খবরটা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়বে। ফলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার মত একটা মুহূর্তের সামনে এসে তাকে দাঁড়াতে হোল। তার সমস্ত শেয়ারগুলোকেই বাজারে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিল সে। সে করলও তাই এবং দ্রুত অন্য কারখানার শেয়ার কিনে ফেলল যে কারখানা ইতিমধ্যেই অনেক অর্ডার পেয়েছে। এভাবে হঠাৎ শেয়ার বিক্রি করে দেওয়া ও উৎপাদন ছাঁটাই করার খবর স্টক্ এক্সচেঞ্জে এক ভীতি ডেকে আনল, ফলে সেই হতভাগ্য কারখানাটার শেয়ারের দাম শুধুমাত্র কয়েক পয়েন্ট নয়, বেশ কয়েক পয়েন্টই কমে গেল। কারখানাটার দিক দিয়ে প্রতিক্রিয়া খুবই খারাপ হোল—বিশ্বাসে দেখা দিল ভাঁটা, উৎপাদন গেল বন্ধ হয়ে আর শ্রমিকদের বসিয়ে দেওয়া হোল। কিন্তু এই পুঁজিপতিটি অনেক টাকাই করে নিল। নিজের ক্ষতিকে এড়াতে ও উল্টে কিছু লাভ করতে সেই মুহূর্তে যা' করার দরকার ছিল সে তাই করল। তবে, যদি মানবিক পুণ্যবোধকে মালিকদের ব্যাঙ্ক-এ্যাকাউন্টের মাপকাঠিতে হিসাব করা না হয়, তবে আমরা কাউকেই বোঝাতে পারব না যে এই পুঁজিপতিটি একজন সত্যিকারের বীর। এছাড়া ঐ পুঁজিপতিটি অন্যভাবেও ব্যাপারটার মোকাবিলা করতে পারত। সেই শেয়ারগুলোকে বিক্রি করে না দিয়ে বরঞ্চ সব ক'টা শেয়ার নিজেই কিনে নিয়ে সে কারখানাটাকে বাঁচাতে পারত ও নিজেই কারখানাটার মালিক হয়ে যেতে পারত। আর শ্রমিকদের মজুরী কমিয়ে দিয়ে (নিজের ক্ষতিকে পুষিয়ে নেবার স্বার্থে যা' খুবই স্বাভাবিক), শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানকে আরও নামিয়ে দিয়ে এবং অভাবের রোগটাকে মানুষের সমাজে আরও বেশী ছড়িয়ে দিয়ে যদি সে সমস্যাটার সমাধান করত, তাহলেও সে একজন বীর হিসাবেই পরিগণিত হতে পারত, কারণ এভাবেও সে টাকা করতে পারত এবং সেই মুহূর্তে তার যা' করা উচিত ছিল, সে তাই করত।

সুতরাং বীরত্বের সংজ্ঞাটা আমাদের বিস্তৃত করতেই হচ্ছে ঃ সেই একজন বীর যে সিদ্ধান্ত নেবার মুহূর্তে মানব-সমাজের স্বার্থেই সব কিছু করে থাকে।

একজন মানুষের জীবন বাঁচানো, মানুষের কল্যাণের স্বার্থে প্রকৃতির ওপর নতুন নতুন বিজয় অর্জন করা, মানুষের সক্ষমতাকে বাড়াতে একজনের যথাসাধ্য করা যাতে করে মানব-সমাজের মূল্যবান সদস্য-ব্যক্তিদের মুক্ত করা যায়—এগুলো হোল একজন বীরের সামনে উন্মুক্ত কতকগুলো সুযোগমাত্র। আর যখনই আমরা বীরত্বের ব্যাপারটাকে সীমায়িত করে ফেলি, এবং বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ থেকে কাজের ব্যাপারটাকেই বাদ দিয়ে দিই তখন বীরত্ব বলতে আর—কি-ই বা পড়ে থাকতে পারে, যা পুঁজিবাদ সৃষ্টি করতে পারে? যুদ্ধ, যুদ্ধ—বীরত্ব প্রদর্শনের কি দারুণ সময়, আহা! বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের কি দারুণ সুযোগ, তাই না? আচ্ছা, এটা কি সত্যিই তাই? সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কি কোন বীর থাকতে পারে? অস্ট্রীয় সৈন্যদের পশ্চাদ্ প্রসারণের পথকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে যে ব্যক্তিটি দ্রিণা নদীর সেতু উড়িয়ে দেয় অথবা একজন রুশ কর্ণেলকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে বলে যে ল্যান্স-কর্পোরাল সাহসিকতার জন্য রূপোর পদক পায়, তারা সম্ভবতঃ পাগ্লামি সংক্রান্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের ভাল নমুনা হ'তে পারে, কিন্তু তারা কখনই বীর বলে পরিগণিত হতে পারে না; কারণ, তাদের কার্যকলাপ শুধুমাত্র মানুষকে হত্যা করতেই সাহায্য করেনি, আরও সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে পুঁজিবাদের লক্ষ্যকে পূরণ করতেই তা' কাজ করেছে। তারা সমাজের স্বার্থে কাজ করেনি, কাজ করেছে সেইসব কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থে যারা যুদ্ধ বাঁধিয়ে সমাজের লুণ্ঠিত সম্পদকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিতে চায়। আর বিশ্বযুদ্ধ যদি বীরদের সৃষ্টি করেও থাকে, তবে তা' এই জন্য নয় যে যুদ্ধে ছিলেন হিণ্ডেনবার্গ বা মার্শাল ফক্ বরঞ্চ এই জন্য যে যুদ্ধে ছিলেন কার্ল লিব্‌নেখ্‌ট্।

যদি সাম্প্রতিককালের বুর্জোয়াদের কাজকর্মকে আমরা খুব গভীরভাবে পর্যালোচনা করি, তাহলে কোনও বীরত্বপূর্ণ কাজের চিহ্নই আমরা সেখানে খুঁজে পাই না। সর্বত্রই আতঙ্ক ত্রাস। শ্রমিকদের এলাকাগুলোতে সশস্ত্র পুলিশ হামলা করে, শ্রমিকদের জন্য মজুত করা থাকে কন্‌সেন্‌ট্রেশন্ ক্যাম্প আর ফাঁসির মঞ্চ। গুলী করে হিট্‌লার হত্যা করে তার নিজেদেরই বন্ধুদের, যাতে করে তার পক্ষে তারা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে না পারে। ম্যাড্রিদের নিরস্ত্র ধর্মঘটী রাজমিস্ত্রীদের ওপর ন্যাশনাল গার্ডরা ছড়িয়ে দেয় বিষাক্ত গ্যাস, সানফ্রানসিস্‌কোয় নিরস্ত্র শ্রমিক-দের ধর্মঘট ভাঙ্‌তে মেশিনগান হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ। শাসকশ্রেণীর তরফ্ থেকে ভয় দেখানোর এই রকম অজস্র ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে, কিন্তু এমন

একটা ঘটনারও উল্লেখ করা যাবে না, যেখানে তারা সাহস দেখিয়েছে অথবা বীরত্ব দেখিয়েছে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমরা বাস করছি এমন একটা সময়ে 'যেখানে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে বীরত্বের অজস্র পরিচয়। এরকম একটা সময়ে ভবিষ্যত যদি ইতিহাসের চেয়ে শৌর্যগাথাকেই বেশী প্রয়োজনীয় মনে করে, তবে মানাস্‌কে ঘিরে সৃষ্ট পুরোনো শৌর্যগাথা যেভাবে কিরঘিজ্‌ ইয়ার্ত্তুদের মধ্যে গাওয়া হয়ে থাকে, সেভাবেই সাম্প্রতিক কালের জীবনের একটা দিনকে ঘিরেই এমন এক মহাকাব্য সৃষ্ট হতে পারে যা'কে একটা গোটা মাস ধরে গাওয়া যেতে পারে। কিন্তু শৌর্যগাথার কোন প্রয়োজনই নেই। যার পাদস্পর্শে সৃষ্টি হয়েছিল তান্‌সান্‌-এর স্বর্গীয় উপত্যকা, যার অশ্রুধারায় সৃষ্টি হয়েছিল বিশাল হ্রদ, সেই মানাস্‌-এর চেয়েও আজকের দিনের বীরেরা অনেক অনেক বেশী বড় বীর। আজকের বীরদের পদচিহ্নে সৃষ্টি হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন এক পৃথিবী, তাদের রক্ত ধুয়ে দিচ্ছে পরজীবীসুলভ সমস্ত আবর্জনা। আমাদের যুগের বীর হোল প্রলেতারিয়েত্‌ শ্রেণী, এবং কেবলমাত্র এই প্রলেতারিয়েত্‌ শ্রেণীই পারে বীরদের সৃষ্টি করতে।

এই প্রলেতারিয়েত্‌ শ্রেণীই সর্বত্র সেই বীরদের সৃষ্টি করে চলেছে—কর্মস্থলে, বিপর্যয় ও সংকটের মুহূর্তে, সংগ্রামের মধ্যে সব জায়গাতেই।

শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাসের যে কোন একটা মুহূর্তকেই বেছে নেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক প্যারী কমিউনের কথা—সেখানে সমস্ত শঠতা ও নীচতা নিয়ে হাজির হয়েছিল বুর্জোয়ারা আর সেখানে কাপুরুষ থিয়ার্সের গোটা সেনাবাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু'লক্ষ কমিউনার্ড প্রাণ দিয়েছিল; তখন তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল কমিউনের জয়ধ্বনি। ধরা যাক লিপ্‌জিগের কথা—যেখানে বুর্জোয়াদের গোয়েরিঙ্‌ মুখোমুখি প্রলেতারীয় শ্রেণীর দিমিত্রভ্‌। সাকো ও ভঞ্জেত্তি, হাঙ্গেরীর কমিউনের বীর রক্ষীরা, ভিয়েনা অভ্যুত্থানের সাহসী যোদ্ধারা, এদের যাদের কথাই ধরা যাক না কেন, এরা সবাই ছিল প্রলেতারীয় শ্রেণীর সাহসী যোদ্ধা আর এদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ারা যা' কিছুকে দাঁড় করাতে পেরেছিল তা' ছিল প্রতিশোধের আকাংক্ষা ও ভয়ের মধ্য থেকে জন্ম নেওয়া নির্ভেজাল শ্বেত-সন্ত্রাস।

চূড়ান্তভাবে আহত হয়ে ভিয়েনার চ্যান্সেলরী আবাসে যখন চ্যান্সেলর ডোল্‌ফাস্‌-এর অন্তিম ঘনিয়ে এসেছিল, তখন তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল: "আমার পরিবারকে তোমরা দেখো।" আর চ্যান্সেলর ডোল্‌ফাস্‌-এর বিশেষ নির্দেশে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সোস্যাল ডেমোক্র্যাট্‌ কর্মী যোসেফ গের্লকে মরতে হয়েছিল ফাঁসির দড়িতে। আর মৃত্যুর আগের দিন তার অন্তিম ইচ্ছায় গের্ল চিৎকার করে

বলেছিল : "স্বাধীনতা দীর্ঘজীবী হোক"! আর এটা কোনভাবেই যেমন কোন আকস্মিক ব্যাপার ছিল না যে, যার জন্য সেই বুর্জোয়া রাজনীতিক ডোল্‌ফাস্‌, যিনি অস্ট্রিয়ার স্বার্থ নিয়ে বক্তৃতার বান ডাকিয়ে দিতেন, যিনি অস্ট্রিয়ার নাম করে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নানা দমনপীড়নের ব্যবস্থা নিতেন, তিনিই জীবনের শেষ মুহূর্তে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া আর কোন কথাই ভাবতে পারেননি ; সেরকম এটাও কোনভাবেই কোন আকস্মিক ব্যাপার ছিল না যে, সেই বিশ বছরের তরুণ শ্রমিক, গের্ল, হঠাৎ মৃত্যুতে যার জীবনের বেশীর ভাগটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, জীবনের শেষ মুহূর্তে সে ভেবেছিল গোটা মানবজাতির ভবিষ্যত স্বার্থের কথা।

বার্লিনের লিচেনফেল্ড-এ একটা প্রাচীর রয়েছে, সেখানে বুলেটের ক্ষতচিহ্ন এখনও স্পষ্ট। স্ট্রুম-ফুরার আর্নেস্টের নির্দেশে ১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারীতে কমিউনিষ্ট পার্টির আশি জন কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। যখন রাইফেলগুলোকে তাদের দিকে উঁচিয়ে ধরা হয়েছিল, তখন তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল 'ইন্টারন্যাশনাল' এবং ঐ বিপ্লবী সঙ্গীতের কথাগুলো কণ্ঠে নিয়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল তারা। আর ১৯৩৪-এর জুলাই মাসে গোয়েরিঙ্-এর রাইফেলের মুখে আর্নেস্টকেই সেই প্রাচীরের দেওয়ালেই পিঠ দিয়ে দাঁড়াতে হোল। যখন তাকে টেনে হিঁচড়ে সেই হত্যামঞ্চে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিল, চিৎকার করে বলছিল যে ওরা নাকি পাগল হয়ে গেছে ; সে তাদের কাছে করুণা ভিক্ষা করছিল, বিনীতভাবে প্রার্থনা করছিল এবং শেষ পর্যন্ত যে বুলেটগুলো তাকে হত্যা করেছিল সেগুলো তার কাছে পোঁছনর আগেই সে মূর্ছা গিয়েছিল। এটা কোনই আকস্মিক ব্যাপার ছিল না, যার জন্য ঐ আশি জন শ্রমিকের একজনও ভয়ে এতটুকুও কম্পিত হয়নি। তারা ভালভাবেই জানত কেন তাদের মরতে হচ্ছিল। এবিষয়েও তাদের মনে ছিল গভীর বিশ্বাস যে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না অথবা শেষ মুহূর্তে কম্পিতও হবে না, কারণ তারা জানত যে, এমন কি মৃত্যুর সময়েও তাদের সাহসিকতা আরও হাজার হাজার মানুষকে জীবনের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবে। এটা কোন আকস্মিক ব্যাপার ছিল না, যার জন্য সেই আর্নেস্ট, সেই অত্যাচারী আর্নেস্ট করুণা ভিক্ষা চেয়েছিল ; সে জানত না যে তাকে মরতে হচ্ছিল কেন, কারণ তার কাছে ব্যাপারটা ছিল এরকমই যে তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে।

এটা কি কোন আকস্মিক ব্যাপার যে যেখানেই প্রলেতারীয় শ্রেণী শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন সেখানেই মানুষের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার ও তাকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে মহৎ বীরত্বের অজস্র সব কাহিনী গড়ে উঠেছে? বলতে গেলে, 'ক্রাসিনা'র

বিপদোদ্ধার অভিযানটাই এমন একটা ঘটনা যা একটা দেশের পক্ষে শত শত বছরের জন্য বীরত্বের একটা নমুনা হয়ে থাকার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ছ'বছর বাদে সেই দেশই জন্ম দিয়েছে অধ্যাপক স্মিদ্‌ত্‌, বোবরভ্‌, মলোকভ্‌, কামানিন ও লায়াপিডিয়েভ্‌স্কি প্রভৃতি বীরদের।

এইসব বীরদের কারুর সঙ্গেই বুর্জোয়ার চিন্তা করতে পারে এরকম বীরদের কোন মিলই নেই। এরা খুবই সাদাসিধে ও অত্যন্ত সাধারণ মানুষ। আর এখানেই এদের বীরত্ব যে তাদের পক্ষে যা' কিছু দেওয়া সম্ভব ছিল তার সবটাই তারা সেই সিদ্ধান্ত নেবার মুহূর্ততে দিয়ে ফেলেছিল, এতটুকুও দ্বিধা করেনি।

এটা হচ্ছে সেই বীরত্ব যা' থেকে আমরা শিক্ষা নিচ্ছি। আর এভাবেই আমরা পরীক্ষার মুখোমুখি হতে চাইছি।

কয়লা-কাটা মজুরের প্রত্যয়

আজ থেকে দশ বছর আগে, এফ. এক্স. সাল্দা চেক সাহিত্যিকদের নবীনতম প্রজন্মের প্রপিতামহ হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন। তা' ছিল সাহসিকতাপূর্ণ একটা কাজ। ভালবাসাময় ও নাড়া-দেওয়া একটা কাজ। সেই পারিবারিক চিত্রটা, যা'তে পিতারা তাদের সন্তানদের বুঝত না, প্রপিতামহ পিতার বিরুদ্ধে পুত্রদের উস্কে দিত, তা' একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে প্রজন্মটা পেয়েছিল এক অভিজ্ঞ উপদেষ্টা, এক বিচক্ষণ ও জঙ্গী সমর্থক। 'শিল্প শুধুমাত্র শিল্পের জন্যই' এই শ্লোগানের বিরোধীতাকারী শিল্পসম্পর্কিত প্রলেতারীয় শ্লোগানের বিরুদ্ধে যা' কিছু বিরোধীতা জড়ো করা হয়েছিল, সেসব কিছুকেই নিকেশ করে দেওয়া হয়েছিল। বিচক্ষণতার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে সাল্দা ওগুলোর গভীরে একেবারে নীচের তলায় চলে গিয়েছিলেন এবং সেগুলোকে সঠিক মাপ মত কাটছাঁট করে নিয়েছিলেন। পুত্রদের সঙ্গে যদি কোন সত্য থাকত, তবে তিনি তা' স্বীকার করতেন এবং তা' এমনভাবেই করতেন যা' শুধুমাত্র একজন সত্যিকারের ভাল ও যৌবনোচ্ছল প্রপিতামহের পক্ষেই সম্ভব। একজন ভাল প্রপিতামহ হওয়াটাও একটা মহৎ শিল্প ; আর সাল্দা নিজে ছিলেন সেই শিল্পের একজন বিশেষজ্ঞ।

পরবর্তীকালে সেই আশ্চর্যজনক পারিবারিক ঐক্যতানে অনৈক্যের কর্কশ সুর বাজতে শুরু করল। পুত্রদের ক্রমাগতই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার প্রবণতা প্রজন্মগুলোর সরল বিন্যাসে জটিলতা ডেকে আনল। সমস্যার গোড়ায় পৌঁছনর জন্য প্রয়োজনীয় দূরদৃষ্টির দুর্বলতা প্রপিতামহটির ক্ষেত্রে ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠতে থাকল। যাদেরকে তিনি বুঝলেন, কার্যকরী কিছুই তারা করতে পারল না আর যাদের ওপর তিনি আশা রেখেছিলেন, তাদেরকে তিনি বুঝলেনই না।

প্রপিতামহ ও পুত্রদের মধ্যে এমন কতকগুলো বিযুক্তি দেখা গেল, যা' তিনি কোনভাবেই মেলাতে পারলেন না।

অবশ্যই এটা বয়সের পার্থক্যজনিত কোন ব্যাপার ছিল না। এটা ছিল স্রেফ শ্রেণীগত পার্থক্যের ব্যাপার।

ছ' মাস আগে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্কটের ওপর তাঁর 'নোটবুক'-এ সাল্‌দা একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমি ঠিক জানিনা কেমনভাবেই বা সেই প্রবন্ধটা আমার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। হয়ত এই ভেবেই সেটাকে উপেক্ষা করা হয়েছিল যে ঐ প্রবন্ধের যুক্তির খোপগুলোতে পৌঁছনর ব্যাপারটা ছিল যথেষ্টই বেদনাদায়ক। বুদ্ধিজীবীদের যুক্তিগুলো কিভাবে উইণ্ডমিলের চাকার মত বাতাসে তাড়িত হচ্ছিল, তাদের কার্যকলাপে কি বিপুল হতাশা ও ব্যর্থতা ফুটে উঠেছিল, তাদেরও প্রকৃত জীবনধারার মধ্যে কি নিদারুণ যোগসূত্রহীনতা প্রকট হয়ে উঠেছিল, সাল্‌দা তার নিজের যুক্তির আধারে সেসবই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর যুক্তিতে এটা ছিল নাকি সবচেয়ে করুণাত্মক এক আত্মত্যাগ। চিন্তাবিদ্‌দের কাছে তিনি আহ্বান রেখেছিলেন যে কথাটা সম্পর্কে গোথের ব্যাখ্যার যেন তাঁরা পর্যালোচনা ও গবেষণা করেন। আর এটা সুবিদিত যে গোথের চিন্তায় অনুভূতি দিয়ে কোন কিছুকে বোঝা মানেই ছিল তাকে জানা। আর সাল্‌দা নিজেই দৃষ্টিশক্তিবিহীন হয়ে পড়েছিলেন—তার দৃষ্টি হয়ে পড়েছিল পশ্চাদ্‌মুখী, ফিরেছিল অতীতের দিকে, সেই 'গৌরবময়' পুরোনো দিনগুলোর দিকে, যা' ছিল তাঁর কাছে বর্তমানের চেয়ে অনেক অনেক বেশী নিখুঁত ও সম্পূর্ণ। প্লেটো, টমাস্ এ্যাকুইনাস্, দান্তে প্রভৃতির স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে তিনি শক্তি-সামর্থ্য খুঁজতে চেয়েছিলেন, যা'তে করে তাঁর নিজের বুদ্ধিজীবী-মানসের সঙ্কট থেকে তিনি নিজেকে বার করে আনতে পারেন। তিনি স্মরণ করতে থাকলেন সেইসব মহৎ পুণ্যগুলোকে যা' একদিন বিজ্ঞান ও শিল্পকলার মহান ব্যক্তিদের চিহ্নিত করেছিল এবং যেগুলোর বর্তমানে নাকি বিলুপ্তি ঘটেছে। তিনি সেগুলোতেই ফিরে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু পথের দেখা তার মিলছিল না এবং এসত্ত্বেও একটা বিষয়কে সাল্‌দা নিজেও এড়াতে পারেননি। বিষয়টা তাঁর প্রবন্ধে খুব সুনির্দিষ্টভাবেই এসেছিল, এবং অবশ্যই যা' তিনি বাতিল করেও দিয়েছিলেন ঃ

"…কেউ কেউ পীড়াগ্রস্থ বুদ্ধিজীবীকে এই বলে পরামর্শ দিয়ে থাকে যে তার উচিত একজন শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকের কাছে যাওয়া এবং সেই শ্রমিকটির সান্নিধ্যেই তার হারানো বিশ্বাসকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করা, যা' ছাড়া জীবন কখনই পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না।

আমি মনে করি নিরাময়ের এই উপায়টা সন্দেহেরও বাড়া। অবশ্যই একজন শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকের প্রত্যয় রয়েছে, রয়েছে সজীব ও দৃঢ় এক প্রত্যয়, যে, শ্রেণী-সংগ্রামে সে বিজয়লাভ করবেই এবং মার্কসীয় সাম্যবাদের নীতি অনুসারে পৃথিবীকে সে সাজাবে। কিন্তু একজন কয়লা-কাটা মজুরের চোখে যে বিশ্বাস বারে বারেই

ফুটে ওঠে তা' অবশ্যই অন্য প্রকৃতির, যে বিশ্বাস না থাকলে আগামীদিনের প্রতি হতাশায় সে ভেঙ্গে পড়বে, আর তা' হোল বৈষয়িক স্বার্থ-তৃপ্তির বিশ্বাস।''

আমাদের দেশে যাদের দেখার মত চোখ ছিল সাল্‌দা ছিলেন তাদেরই একজন; সেই সাল্‌দাও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলছেন, তিনিও অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন। আর তা' মোটেই বয়সের জন্য নয়, তা' তাঁর শ্রেণী-সংলগ্নতার জন্যই। অনেক লোকই রয়েছে যারা অন্ধ, কারণ তারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধরত আর তাই শত্রুতাই তাদের অন্ধত্বের জন্য দায়ী। কিন্তু, সাল্‌দা তো তাদের একজন নন। তবুও তার চোখের ওপর জমে উঠেছে অনভিপ্রেত এক কালো আস্তরণ আর তিনি দেখছেন একজন কয়লা-কাটা মজুরকে। আর যে মহৎ অগ্নিশিখার দীর্ঘ প্রতীক্ষায় বসে রয়েছেন সাল্‌দা, তা'ই নাকি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে সেই মজুরটির চোখে।

একজন শ্রমিকের বিশ্বাস বলতে সাল্‌দা বোঝেন বৈষয়িক স্বার্থ প্রণোদিত এক ধরণের তৃপ্তির বিশ্বাস। একজন শ্রমিক অবশ্যই বস্তুবাদী, কিন্তু যে বিশ্বাস একজন বুদ্ধিজীবীর সম্পদ তা' অনেক উঁচু প্রকৃতির, তা' হোল ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রভাবমুক্ত এক আদর্শবাদী বিশ্বাস, এক সাহসিকতাপূর্ণ বিশ্বাস, এক সৃজনশীল বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাস অবশ্যই সাল্‌দা'র শ্রমিকের থাকতে পারেনা। সাল্‌দা'র শ্রমিক শুধু চায় মজুরী বাড়ুক, সে চায় আরও বেশী ভালভাবে মানুষের মত জীবন ধারণ করতে; আর যখনই তার সেই চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে, তার শক্তিও ফুরিয়ে যায়। আর অন্য কোন ধারণাই সাল্‌দার নেই। যে বিদকুটে যুক্তির ভাঁড়ার তার রয়েছে, তা' দিয়েই তিনি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দর্শনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের বস্তুবাদের সঙ্গে জোড়া লাগাতে চাইছেন; আর এই মাটি দিয়েই গড়া হচ্ছে সাল্‌দার শ্রমিকটি।

আমাদের শ্রমিকদের অর্থাৎ শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকদের সঙ্গে কয়লা-কাটা সেই মজুরটির রয়েছে দারুণ অমিল, যেমন অমিল রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে বুর্জোয়াদের। একজন শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকের চোখে ওধরণের কোন ঝিলিকই ফুটে ওঠে না। একজন শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক নিশ্চিতভাবেই সাল্‌দা'র চিন্তাবিদ্‌দের থেকে অনেক পরিষ্কারভাবে, অনেক গভীরভাবে ও অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পায়। আজকে যা' কিছু সজীব ও প্রাণময়, যা' কিছু শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে ওঠে, যার মধ্য থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃখ-কষ্টের সবকিছু, আলোচ্য বুদ্ধিজীবীদের সঙ্কটের উৎসও যা' থেকে, এই সমস্ত কিছুতেই প্রাণরস প্রবাহিত করে থাকে যা' তার একেবারে মূলে গিয়ে পৌঁছয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিশ্বসম্পর্কিত বোধ। গভীর ও মৌলিক এই বোধ এক অনন্ত সৃজনশীল শক্তির মত কাজ করে, অতীতে যা'র কোন অস্তিত্বই ছিল না। সামাজিক গঠনকর্মের একেবারে চূড়ান্ত গভীরে যদি তুমি

তাকিয়ে দেখ, তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে তুমি একটা অতিকায় যন্ত্রকে চালু করে দিয়েছ, যা' পরিকল্পনার ছক্ তৈরী করছে, নতুন পৃথিবীর জন্য ভিত্ গড়ছে, নির্মাণ করছে নতুন নতুন বাড়ী-ঘর। আর যদি তুমি এটা বুঝতে পার, তাহলে সবকিছুকে পাল্টে ফেলার জন্য, নতুন শস্যের বীজ বোনার আর চাষ করার উজ্জ্বল আকাংক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়ে তুমি পারবে না।

এটা কি খুব কম হোল ?

আজ পর্যন্ত যা' কিছু প্রত্যাশা করা হয়েছে অথবা যেটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে, এটা তার চেয়ে অনেক বেশী।

ঘড়ির কাঁটাটাকে পেছনে ফিরিয়ে দাও, কালের গভীরে অনেক পেছনে ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও আজকের সভ্যযুগের ঊষাকালের কোন এক অতীতে, তাহলে তুমি এমন অনেক মানুষেরই দেখা পাবে, যারা এই পৃথিবীর অস্তিত্বটাকেই অস্বীকার করতে চেয়েছিল, আর সেটা প্রমাণ করতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হাতড়ে বেড়িয়েছিল তারা। অথচ, এখন এই পৃথিবীতেই আমাদের চারপাশে এমন অনেকেই রয়েছে, যাদের রয়েছে আরও কত বেশী বীরত্বব্যঞ্জক চিন্তাধারা, আরও কত বেশী সাহস! আর তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পালিয়ে না গিয়ে ও কাল্পনিক কোন কিছুর সাহায্য না নিয়েই, শুধুমাত্র তাদের নিজেদের হাত দিয়েই তারা ঠেলে তুলবে এই পৃথিবীটাকে এবং আর একটা সমতলে এনে দাঁড় করাবে ; আর যদি তুমি চাও তাহলে সূর্যের আরও কাছে, সমস্ত লোকজনদের নাগালের মধ্যেই এনে দেবে।

ভালকথা, হয়ত ঘটনাটা এই যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই এমন কিছু রয়েছে যা' আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু যা' কিছু স্বর্গের এক্তিয়ারে, সেগুলো নিয়ে কিছু করা বা সেগুলোর দিকে ফিরে তাকানোর কথা তো আগে কখনই এমনভাবে শোনা যায়নি! তাই সাহায্যের জন্য প্রতীক্ষা করার কিছুই নেই, বরঞ্চ এত বেশী শক্তি আমাদের নিজেদেরই রয়েছে, যার জন্য সমস্ত রহস্যময় উচ্চশ্রেণীর ক্ষমতাবান-দের এমন কি অতীতযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্‌দেরও খুব সহজেই আমরা উপহাস করতে পারি। কি দারুণ বস্তুবাদীই না আমরা! তাই ওপর দিকে না তাকিয়ে সমস্ত কিছুর কারণানুসন্ধানের জন্য তাকাও নীচের দিকে। সেইসব দুর্বল কল্পনা-বিলাসীরা, যারা এগিয়ে চলতে অক্ষম, তারা এই ধরণের চিন্তা ও ধারণাতে মোটেই তৃপ্ত হতে পারে না, কারণ তারা দায়িত্ব থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টায় থাকে, তারা স্বপ্নের গভীরে আশ্রয়ের নীড় খোঁজে, ব্রহ্মাণ্ডের অতুল ঐশ্বর্যের স্বপ্নেইতারা মশগুল হয়ে থাকতে চায় আর ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে বন্ধনের মহত্ত্বেই তারা নিজেদের মহান মনে করে!

আমরা, যারা কয়লা-কাটা মজুরের প্রত্যয়ের শরিক, তারা পৃথিবীর এই শৃঙ্খলকে ভেঙ্গে ফেলব, ভেঙ্গে ফেলব 'ব্রহ্মাণ্ডের শৃঙ্খল' ও সেই সমস্ত কিছু যা' বন্ধ্যাত্বের জন্য দায়ী।

আমরা, কয়লা-কাটা মজুরের প্রত্যয়ের শরিক জনগণ। সেই বিজ্ঞান আমরা চাই না যা স্বাধীনতার অভাবকে উঁচুতে তুলে ধরে, সেই শিল্প চাই না যা' স্ক্রুটাকে আরও শক্ত করে চেপে ধরে। আমরা চাই সমস্ত সৃজনশীল শক্তির মুক্তি, আমরা চাই স্বাধীন মানুষ, চাই স্বাধীন শ্রমিক, স্বাধীন শ্রষ্টা। আমরা এমন সব কাজ করতে চাই যা' তুমি অতীতের কোথাও দেখতে পাবে না। পৃথিবীর ষষ্ঠাংশে, তারা ইতিমধ্যেই তা' সৃষ্টি করে চলেছে। পৃথিবীর ষষ্ঠাংশে জীবনের বিকাশই প্রমাণ করে দিচ্ছে কয়লা-কাটা মজুরের প্রত্যয়টা কতখানি বাস্তব।

আমরা, কয়লা-কাটা মজুরের প্রত্যয়ের শরিক জনগণ। সেইসব অনেক ব্যক্তি, যারা এখনও প্রলেতারীয় বিপ্লবের মহান পথটাকে বুঝে উঠতে পারেনি, তাদেরকে দ্রুত ধ্বংসের গভীরে ঠেলে নিয়ে চলেছে যে সঙ্কট, আমরা ঘোষণা করছি সেই সঙ্কট আমাদের ধরতে পারেনি। আমরা লড়াই করছি আবার সৃষ্টিও করছি। লড়াই চালাতে গিয়ে মরতেও হচ্ছে আমাদের। ন্যায়বাগীশ বুদ্ধিজীবীরা খুব বোঝদারের ভঙ্গীতে হয়ত বলবে, "হায়! ওরা শুধু শুধুই জীবন দিচ্ছে! আমি তো শুধুমাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার শান্তি ও স্থিতি বিসর্জন দিয়েছি, যাতে করে আমার কবিতার ভাবকে প্রকাশ করার জন্য উপযুক্ত শব্দাবলী চয়ন করতে পারি।" ন্যায়বাগীশ বুদ্ধিজীবীর মৃত্যু হয় সুন্দর কবিতার জন্য আর আমরা যারা কয়লা-কাটা মজুরের প্রত্যয়ের শরিক জনগণ, সেই আমাদের মৃত্যু হয় জীবনের সুন্দর ছন্দের জন্য, পৃথিবীর সার্থকতম সৃষ্টির জন্য।

আচ্ছা, যারা নপুংসক বুদ্ধিজীবী, যেভাবে খুশী তারা পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করে চলুক, যাতে করে তারা সৃষ্টি করতে পারে ছন্দাবলী ও চিত্রমালা।

আমরা, কয়লা-কাটা মজুরের প্রত্যয়ের শরিক জনগণ আমরা সেসব কিছুকে পাল্টে দেব।

মানুষের অন্তর্জগতের ডারউইন

(প্রয়াত ইভান পেত্রোভিচ্ পাভ্‌লভ্ প্রসঙ্গে)

মস্কো, ফেব্রুয়ারীর শেষ, ১৯৩৬

কথাগুলো প্রথম শোনা গেল রেডিওতে, তারপর রাস্তায় ঃ

"ইভান পেত্রোভিচ্ পাভ্‌লভ্ মারা গেছেন ··· "

সকালবেলা, লোকেরা দ্রুত পদক্ষেপে কাজে চলেছিল। কিন্তু কথাগুলো তাদের চলার গতিকে কমিয়ে দিল।

সেই মহান ও বিচক্ষণ বিজ্ঞানী, যিনি ছিলেন গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিচিত ও ভালবাসার মানুষ, সেই ইভান পেত্রোভিচ্ পাভ্‌লভ্ মারা গেছেন। তাঁর বিজ্ঞান রচনাবলীর মোটা খণ্ডগুলোর ও গবেষণাগারের মধ্যেই আটকে ছিল না। তাঁর গবেষণার ফল সোভিয়েত ইউনিয়নের কলকারখানার শ্রমিকদের ও গ্রামাঞ্চলের যৌথ খামারের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। হয়ত লক্ষ লক্ষ লোকে তাঁর পরীক্ষাপদ্ধতিগুলো এবং পাকস্থলীর ক্ষরণ ও লালাগ্রন্থির ক্ষরণের সঙ্গে মস্তিষ্কের কার্যকারিতার সম্পর্কটা ঠিক বুঝতে পারত না, কিন্তু সবাই এটা বুঝতে পারত যে প্রকৃতির কাছ থেকে মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তির রহস্যটা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ইভান পেত্রোভিচ্ পাভ্‌লভ্। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, তিনি এমনভাবে মানুষকে সাহায্য করেছিলেন যাতে করে সে নিজেকে বুঝতে পারে, নিজের শক্তিকে সংরক্ষণ করতে পারে এবং এভাবেই নিজেকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।

ভাববাদী দার্শনিকরা রহস্যময় সব তত্ত্বের আড়ালে নিজেদের অজ্ঞতাকে ঢেকে রাখত। তারা মানুষকে ভেঙ্গে ফেলত দু'টো সত্ত্বায়—দৃশ্যমান শরীর ও অদৃশ্য আত্মায়। এমনকি বড় বড় শরীরতত্ত্ববিদ্‌রাও প্রায়শই ঐ সব ভাববাদী ধ্যান-ধারণাগুলোকে স্বীকার করে নিত। তারা এটা করত কারণ, এর দ্বারা তাদের নিজেদের কাজগুলোকে তারা সহজ করে ফেলতে পারত এবং এর দ্বারা সেইসব প্রশ্নগুলোর সম্ভাব্য ঝামেলাগুলো তারা এড়িয়ে যেতে পারত, যেসব প্রশ্নগুলোর উত্তর তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না।

সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের গোড়া থেকেই ইভান পেত্রোভিচ্ পাভ্‌লভ্ এইসব জটিল প্রশ্নগুলোর ওপরেই কাজ করে গেছেন। বছরের পর বছর ধরে কুকুরের ওপর নানা পরীক্ষাকার্য চালিয়ে 'আত্মা'র শরীরতাত্ত্বিক নিয়মকানুনগুলো তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তিনি কুকুরের 'আত্মা'কে বুঝতে শিখেছিলেন, চিনতে শিখেছিলেন কুকুরের ইচ্ছা-আকাংক্ষা ও স্বপ্নগুলোকে যা'তে করে মানুষের অন্তর্জগতের নীতিগুলোকে বুঝতে পারা যায়। অক্লান্তভাবে ও অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে ওগুলো তাঁকে শিখতে হয়েছিল এমনকি অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ঘটনা যা' কিছু তিনি পর্যবেক্ষণ করতেন তাই তিনি লিখে রাখতেন, আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা ধরেই এসব তিনি করতেন না, করতেন বছরের পর বছর ধরে যা'তে করে শুধুমাত্র কোন প্রকল্পে নয় একেবারে সূত্রে তিনি পৌঁছতে পারেন।

তিনি পৌঁছেছিলেনও। এভাবেই তিনি এমন কতকগুলো সূত্রে পৌঁছেছিলেন যেগুলোকে তিনি মানুষের ওপর প্রয়োগ করতে শুরু করেছিলেন আর তখনই মৃত্যু এসে তাঁর সমস্ত কাজের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। যদিও তাঁর বয়স হয়েছিল সাতাশী বছর, তবুও তার এই মৃত্যুকে এক অসময়ের মৃত্যু বলেই আমাদের মনে হয়। যে কাজ তিনি সম্পন্ন করার জন্য রেখে গেছেন, তা' আজও অসমাপ্ত রয়েছে। কিন্তু সেই কাজগুলোর মৌলিকত্ব এতই বেশী, সেগুলোর ওপর গড়ে ওঠা বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলো এতই পরিচ্ছন্ন ও বাস্তবের দ্বারা সমর্থিত যে, কাজগুলো নিশ্চিতভাবেই নিষ্পন্ন হবে, এবং এমনভাবেই সেগুলো নিষ্পন্ন হবে যে মনে হবে, প্রয়াত বিজ্ঞানী নিজেই যেন কাজগুলো করছেন।

ইভান পেত্রোভিচ্ পাভ্‌লভ্ হলেন মানুষের অন্তর্জগতের ডারউইন। তিনি এমন একজন বিজ্ঞানী যিনি এক মহান বিপ্লবকে নিষ্পন্ন করেছেন। তার নামটিই এক নতুন বিজ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। মানুষের ইতিহাসে এটা এমন একটা অধ্যায়ের শিরোনাম, লোকেরা চিরদিনই যা' মনে গেথে রাখবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষেরা ইভান পেত্রোভিচ্ পাভ্‌লভ্‌কে তাঁর মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই জানত ও যথাযোগ্য মর্যাদা দিত এবং অক্টোবর বিপ্লবোত্তর-কালে ইভান পেত্রোভিচ্ পাভ্‌লভের জীবন ছিল খুবই আকর্ষণীয় একটা বিষয় আর তা' ছিল উভয় কারণেই—একাধারে তাঁর জনপ্রিয়তা ও অন্যদিকে তাঁর নিজেরই রাজনৈতিক বিকাশ।

বিপ্লবের অনেক আগে থেকেই বিশ্বের শরীরতত্ত্ববিদ্‌রা অধ্যাপক পাভ্‌লভ্‌কে চিনত। তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজগুলোকে যতখানি আক্রমণ করা হোত, সেগুলোকে মূল্যবান মনে করাও হোত ততখানি। ১৯০৪ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া

হোল, আর এই পুরস্কার তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিতেই সাহায্য করল, কারণ পাভ্‌লভের বস্তুবাদী হওয়াটাকে বুর্জোয়া বিজ্ঞান কখনই ক্ষমা করতে পারত না।

এমন কি জার সরকারের প্রতি আচরণেও পাভ্‌লভের সেই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীটাই প্রতিফলিত হোত। পাভ্‌লভ্‌ ছিলেন একজন বিরল প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ, সর্বোপরি বিশ্ববিজ্ঞানে তিনি ছিলেন এক সুপরিচিত ব্যক্তি; আর এসবই জার সরকারকে বাধ্য করেছিল তাঁর প্রতি স্বীকৃতি জানাতে এবং বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হ'তে অনুমতি দিতে (যদিও ঘটনাপ্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা উচিত যে তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর অন্ততঃ তিনটে বছর কেটে যাবার পর এসব স্বীকৃতি তাঁর জুটেছিল)। আসলে জার সরকার তাঁর কাজকর্মের ক্ষেত্রে এমন সবকিছুই করেছিল যা'তে পাভ্‌লভের অস্তিত্বই বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। সেই সব মহৎ গবেষণাগুলো তাঁকে চালাতে হয়েছিল অকিঞ্চিৎকর ল্যাবরেটরীতে, আর আর্থিক সমর্থনের হাল এমনই ছিল যে বেসরকারী ব্যক্তিদের কাছ থেকেও তাঁকে সাহায্য চাইতে হোত। তিনি নিজে এমন দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করতেন যে যা'তে তিনি খেতে পান সেজন্য তাঁর বন্ধুরা গোপনে টাকা পয়সা যোগাড় করে তাঁকে দিত।

বিপ্লব সমস্ত কিছুকেই বদলে দিয়েছিল, কিন্তু পাভ্‌লভ্‌ নিজে সেসব বিশ্বাস করতেন না। প্রলেতারিয়েত্‌রা যে রাষ্ট্র চালাতে পারে এবং মানবজাতিকে আরও সুন্দর এক আগামীকালের দিকে নিয়ে যেতে নেতৃত্ব দিতে পারে, একথা পাভ্‌লভ্‌ বিশ্বাসই করতেন না। ল্যাবরেটরীর চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে, তিনি দেখেনও নি এবং দেখতেও চাননি শ্রমিকশ্রেণীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, তার বিজয় ও তার পুনর্গঠনকার্য। তিনি সোভিয়েত সরকারকে মেনে নেননি এবং সেকথা গোপনও করেননি। উল্টে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই তিনি সবকিছু করেছিলেন। যিনি ছিলেন একজন কট্টর বস্তুবাদী, যাঁর সমগ্র বৈজ্ঞানিক মনোভাবই ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই প্রশ্ন করত, সেই পাভ্‌লভ্‌ই গির্জায় যেতে শুরু করেছিলেন এবং সর্বসমক্ষে প্রতিটা গির্জা-গৃহের সামনে দাঁড়িয়ে বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকতে থাকলেন; তিনি ভ্রূক্ষেপও করতেন না সেই গৃহটা তখনও 'গির্জা' হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল কিনা অথবা সেটা ইতিমধ্যেই শ্রমিকদের ক্লাবে কিংবা ধর্ম-বিরোধী কোন মিউজিয়মে পরিণত হয়েছিল কিনা। তাঁর সাহিত্যকর্মকে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে শুরু করেছিলেন। সোভিয়েত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বক্তৃতা দিতেও তিনি অস্বীকৃত হয়েছিলেন। তাঁর মতানুসারে

শ্রমিক-কৃষকের সরকারের প্রতি অবজ্ঞা দেখাতেই তিনি যা' কিছু করতে পারতেন তার সবকিছুই তিনি করেছিলেন ··· কিন্তু যে কোন কারণেই হোক বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম তিনি কখনই থামাননি।

আর সেজন্যই তাঁর অজস্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও শুধুমাত্র তাঁর অবিচলিত বিজ্ঞান চর্চা ও বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের জন্যই তিনি পেয়েছিলেন প্রলেতারিয়েতের সম্মান ও মর্যাদা। সোভিয়েত সরকার সবরকম সুযোগ সুবিধা তাঁকে দিয়েছিল যা'তে করে তাঁর কাজকে নিখুঁতভাবে তিনি করে যেতে পারতেন। সোভিয়েত সরকার ব্যক্তিগত জীবনের অভাব অনটন থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়েছিল, পরীক্ষাকার্য ও গবেষণার জন্য যা' কিছুর প্রয়োজন তাঁর ছিল তার সবই তাঁকে যুগিয়েছিল। পুরোনো অকিঞ্চিৎকর ল্যাবরেটরীর জায়গায় নতুন ও সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রপাতি-সজ্জিত এক ল্যাবরেটরী তাঁর জন্য তৈরী করে দেওয়া হয়েছিল; সর্বোপরি ইভান পেত্রোভিচের অধীনে রাখা হয়েছিল ল্যাবরেটরী ও ইন্‌স্টিটিউটে পরিপূর্ণ একটা গোটা বিজ্ঞান-নগরীকে।

ক্রমে ক্রমে বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের সীমানার বাইরে তাঁর দৃষ্টিকে তিনি প্রসারিত করতে শুরু করেছিলেন। এটাই তিনি বুঝতে শুরু করেছিলেন যে চারপাশে যা' ঘটে চলেছিল তা' কোন ফাঁকা ভণিতার ব্যাপার ছিল না বরঞ্চ এটাই দেখানোর চেষ্টা চলছিল যে সংস্কৃতি ব্যাপারটাকেও তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজগুলোকে বল্‌শেভিক্‌রা যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে থাকে। তিনি বুঝতে শুরু করেছিলেন যে তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে সাফল্যের বৃদ্ধি ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মধ্যে এক প্রত্যক্ষ ও স্বাভাবিক যোগসূত্র রয়েছে এবং বলতে গেলে শেষ পর্যন্ত তিনি সবকিছুই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি এটাই বুঝতে পেরেছিলেন যে যারা একটা নতুন পৃথিবী গড়ে তুলছিল, তাঁর বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণাগুলো তাদের অনেক কাছের জিনিষ, অনেক প্রিয় জিনিষ আর তিনি এটাও বুঝে ফেলেছিলেন যে সেই নতুন পৃথিবীতেই তাঁর কাজগুলো বেঁচে থাকতে পারে, পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকতে পারে।

একথা ভেবে তিনি নিজেই হেসেছিলেন যে কি নিদারুণভাবেই না তিনি বিপ্লবের বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি জানিয়েছিলেন। তবে এসব সত্ত্বেও তিনি নিজে কোনভাবেই একজন প্রতিবিপ্লবী হতে পারতেন না কারণ এক নতুন বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছিলেন তিনি। পরে তিনি নিজেই যা' ছিল এবং যা' হয়েছে এদের মধ্যকার পার্থক্যগুলো তুলে ধরতে শুরু করেছিলেন, তুলনামূলকভাবে সেসব কিছুকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছিলেন। তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন কিভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞানের উন্মীলন ও উত্থান ঘটেছিল, এবং কিভাবেই না ধনতান্ত্রিক

আমেরিকা ও ফ্যাসিস্ত্ জার্মানীতে বিজ্ঞানকে বিক্ষত বিব্রত করা হচ্ছিল। এক পুরোনো ডারউইনীয় তত্ত্ব উদ্ধৃত করে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে ফ্যাসিজম্ হোল মানব-সভ্যতার ওপর এক গোরিলা আক্রমণ ; তিনি এটাও সম্পূর্ণভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, যেহেতু আইনস্টাইন বলশেভিক্‌দের বন্ধু ছিলেন এবং এক নতুন বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছিলেন, সেইজন্য ফ্যাসিস্ত্‌রা আইনস্টাইনকে শত্রু হিসাবে ঘোষণা করেছিল।

পাভ্‌লভ্ এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে, নতুন পৃথিবীতে বিজ্ঞান শুধুমাত্র ল্যাবরেটরীর চার দেওয়ালের মধ্যেই বেঁচে থাকে না, তা' বেঁচে থাকে জাতির সামগ্রিক জীবন ধারায়। গত বছরে যখন তাঁর নিজের জন্মস্থান রিযাজান্-এ তিনি যান ও সেখানের যৌথ খামারের চাষীদের সঙ্গে দেখা করেন, তখন তাদের মুখ থেকেই তিনি জানতে পারেন কিভাবে তারা তাঁর কাজের পরিচ্ছন্ন ও সঠিক প্রয়োগ করেছিল। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ

"বিজ্ঞান এতদিন পর্যন্ত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছে, জনসাধারণ থেকে বিযুক্ত থেকেছে ; কিন্তু আমি এখন অন্য কিছু দেখছি ; আমি দেখছি—বিজ্ঞানকে মূল্য দেওয়া হচ্ছে, মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে এবং সমগ্র জাতির পক্ষ থেকেই তা' করা হচ্ছে। আমি পান-পাত্র তুলে ধরছি এবং পৃথিবীর একমাত্র সরকার, আমার দেশের সরকার, যে সরকার এটা করতে পেরেছে, তার উদ্দেশ্যেই পান করছি।"

ইভান পেত্রোভিচ্ পাভ্‌লভ্ একজন সোভিয়েত মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক কর্তৃত্বের সমগ্র সত্তার নিয়ে তিনি শ্রমিক-কৃষকের সরকারের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করেছিলেন। আর তিনি তা' করেছিলেন কোন প্রচার কার্যের কাছে নতি স্বীকার করে নয় ; তিনি তা' করেছিলেন কারণ তাঁর বিজ্ঞানই তাঁকে এটা বোঝাতে পেরেছিল বলে।

এই মহান বিচক্ষণ বিজ্ঞানী, যিনি সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকদের ভালবাসা পেয়েছিলেন, পরিচিত ছিলেন তাদের সবার সাথে, সেই পাভ্‌লভের মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ গভীর শোকে নিমজ্জিত।

কিন্তু ইভান পেত্রোভিচ্ পাভ্‌লভ্ এমন এক দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন, যেখানে তাঁর মহৎ কাজগুলোর কোন দিনই মৃত্যু হবে না।

ম্যাক্সিম্ গোর্কী

সমগ্র সোভিয়েত জনগণের ভালবাসার মানুষ গোর্কীর মৃত্যুসংবাদ বজ্রপাতের মত মস্কোতে ছড়িয়ে পড়ল। গোটা শহরের ওপর নেমে এল মৃত্যুর পাণ্ডুর আচ্ছাদন। বিকেলের দিকেই খবরটা জানা গিয়েছিল, আর সন্ধ্যা হতে না হতেই কালো ক্রেপ্ কাপড়ে মোড়া লাল পতাকাগুলো সমস্ত গৃহ-শীর্ষ থেকেই উড়তে থাকল।

ম্যাক্সিম্ গোর্কীর নিদারুণ পীড়ার সংবাদ সম্বলিত নিষ্ঠুর বুলেটিনগুলো গত ক'দিন ধরেই প্রকাশিত হচ্ছিল এবং যখন ঐরকম একটা বুলেটিনে বলা হয়েছিল যে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদ-ক্রিয়ার উন্নতি ঘটেছে, তখন আমরা আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিলাম ; মনে হয়েছিল যেন সব বিপদই কেটে গিয়েছিল, কারণ গোর্কীবিহীন সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা আমরা ভাবতে পারছিলাম না।

যখন টেলিগ্রামটা খুব নিশ্চিতভাবেই তাঁর মৃত্যুসংবাদকে সমর্থন করল, তখনও আমরা সেটা ঠিক গ্রহণ করতে পারছিলাম না। এরকমটা হোল, কারণ, তাঁর প্রাণবন্ত উদ্যোগ তখনও সক্রিয় ছিল, তাঁর কথাগুলো তখনও কানে বাজ্ছিল ; আর সেগুলো শুধুমাত্র একজন মহান মৃতের স্মরণীয় ও অপরিবর্তনীয় কতগুলো কথাই ছিল না, সেগুলো ছিল এমন একজন জীবন্ত বন্ধুর কথা, যে বন্ধু যুক্তিতর্ক করছেন, পরামর্শ দিচ্ছেন, অপরকে বোঝাচ্ছেন আবার নিজেও বুঝছেন, যিনি একদিকে জঙ্গী আবার অন্যদিকে ভালবাসার মানুষ, যিনি সব সময়েই এমন নতুন সব ধ্যান-ধারণায় ভরপুর হয়ে থাকেন যে সেগুলো থেকে স্বতঃই উৎসারিত হ'তে থাকে তাঁর মহান কাজগুলো, সমষ্টিগত কাজগুলো।

তিনি জীবনকে জানতেন ও ভালবাসতেন এবং অন্য সমস্ত কিছুকে ও সেই সব মানুষকে তিনি অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন যারা জীবনকে আগাছার স্তরে নামিয়ে এনেছিল। জারের রাশিয়াকে তিনি ঘৃণা করতেন, কারণ তাঁর কাছে সেই রাশিয়া ছিল এক নোংরা মলিন অন্ধকারময় রাশিয়া, এক ভয়াবহ দাসত্বের শৃঙ্খলিত রাশিয়া। তাই তিনি নতুন জনগণের জন্য চাইতেন প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন, আলোকোজ্জ্বল এক রাশিয়া। তাঁর মত এত পরিষ্কারভাবে জারের রাশিয়া সম্পর্কে, সেই রাশিয়ার বুর্জোয়াদের

সম্পর্কে এবং শ্রমিক ও মুঝিক্‌দের সম্পর্কে সত্যকথাগুলো কোন রুশ সাহিত্যিকই বলেননি। আর তাঁর কথাগুলো এতখানি কার্যকরী ছিল কারণ, সেগুলো ছিল লড়াইয়ের সত্য। কখনই কোন ঘটনাকে খুব সহজে তিনি প্রতিষ্ঠা করতেন না; তিনি শুধুমাত্র তাকিয়েই দেখতেন না, তিনি সব সময়েই লড়াই করে যেতেন। আর এসবের জন্যই তিনি কখনও বুর্জোয়া হতে পারলেন না।

একজন ভবঘুরের মত রাশিয়ার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত চষে বেড়িয়েছেন তিনি, লড়াইয়ের জন্য খুঁজেছেন অবলম্বন। আর এভাবেই হঠাৎ তিনি পেয়ে গেলেন। তিনি আবিষ্কার করলেন লেনিনকে, আবিষ্কার করলেন বল্‌শেভিক্‌দের, আবিষ্কার করলেন বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীকে এবং তখনই তাঁর লক্ষ্যকে তিনি প্রলেতারীয় বিপ্লবের সাফল্যের সঙ্গে এক সাধারণ সূত্রে গেঁথে ফেললেন। এই শতাব্দীর শুরুতেই যে পথ ধরে চলতে শুরু করেছিলেন তিনি, রোম্যাঁ রোলাঁ ও সমসাময়িক সংস্কৃতির অনেক মহান হৃদয়বেত্তারই সেই পথে আসতে আরও প্রায় তিরিশ বছর লেগে গিয়েছিল। নিজের বিকাশের শুরু থেকেই ম্যাক্‌সিম্‌ গোর্কী যেভাবে জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, সেভাবে আর কেউই জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন না।

জনগণের সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাই গোর্কীকে যুগিয়েছিল এক অনন্য শক্তি। জনগণের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের সংপৃক্তিই বিশ্বসাহিত্যকে দিয়েছে গোর্কীর বিখ্যাত গ্রন্থসম্ভার। আর গোর্কীর সঙ্গে জনগণের গভীর সম্পর্কের এই মেলবন্ধনই বিশ্বসাহিত্যকে দিয়েছে অন্যান্য লেখকদের বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ। একদিকে নতুন লেখক প্রজন্মের শিক্ষক ছিলেন যেমন গোর্কী, সেরকম সমসাময়িক অনেক লেখকের কাছেও তিনি ছিলেন শিক্ষক।

গোর্কী সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন, "তিনি ছিলেন প্রলেতারীয় শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি এবং আগামীদিনে আরও অনেক কিছুই করার জন্য ইতিমধ্যেই যিনি করে ফেলেছেন এত কিছু।" লেনিনের ঐ মূল্যায়ন ছিল গভীরভাবেই সঠিক, তা' ঘটনার বিবৃতি হিসাবে যতখানি, ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবেও ততখানি। সেই সাহিত্যকর্মেরই মহত্তম প্রতিনিধি ছিলেন ম্যাক্‌সিম্‌ গোর্কী, যা' বিপ্লবের স্বার্থে ছিল একান্তই অপরিহার্য; আর সেজন্যই শ্রমিক-শ্রেণী ক্ষমতা লাভ করলেও তাঁর কাজ তখনও শেষ হয়ে যায়নি।

সোভিয়েত জীবনের প্রতি তাঁর ছিল অনন্ত দরদ। সোভিয়েত জীবনের প্রতিটা গতিবিধি, উত্তরণের অভিমুখে এর প্রতিটা পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন এবং এগুলো যা'তে তাঁর চোখ এড়িয়ে না যায়, সেজন্য সমসাময়িক

একজন ব্যক্তি হিসাবে ইতিহাসের গভীরে ডুবে থেকেই তিনি এসব কিছু বুঝতে চেষ্টা করেননি, বরঞ্চ একজন বিচক্ষণ চিন্তাবিদ্ হিসাবে সময়ের দূরত্ব থেকেই তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন, জেনেছিলেন ইতিহাসগতভাবে কোনটা মূল্যবান এবং সমসাময়িকদের প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ ভবিষ্যতের জন্যই বা কি প্রত্যাশা করা যেতে পারে। আর সেজন্যই এমন মহৎ অনেক কিছুরই উদ্গাতা ছিলেন তিনি যা'র মধ্যে ঘনীভূত হয়েছিল সোভিয়েত বাস্তবতার সামগ্রিক বিকাশ।

তাঁর উদ্যোগেই 'গৃহযুদ্ধের ইতিহাস' আত্মপ্রকাশ করে, আত্মপ্রকাশ করে 'কলকারখানার ইতিহাস', জন্ম নেয় 'গ্রামসমূহের ইতিহাস'—যেগুলোকে বলা যেতে পারে সোভিয়েত জীবনধারার সবচেয়ে মূল্যবান সাহিত্যিক দলিল এবং যেগুলোর ভিত্তিতেই অনেকে আজকের সোভিয়েত জীবনকে শেখার কাজ শুরু করতে পারে।

ম্যাক্সিম্ গোর্কী—প্রেরণার উৎস গোর্কী!

আর যখনই তাঁর নাম উচ্চারিত হতে থাকে, তখনই এসব কিছু শোনা যায়। উজ্জ্বল অনুপ্রেরণাময় তাঁর শারীরিক উপস্থিতিকে হারিয়ে সোভিয়েত সংস্কৃতি কি নিদারুণভাবেই না ক্ষতিগ্রস্ত হোল!

শুধুমাত্র যে সোভিয়েত সংস্কৃতিরই ক্ষতি হোল তাই নয়; সারা দুনিয়ার সংস্কৃতি, মানবজাতির বিপ্লবী সংস্কৃতিও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হোল।

অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের পরেও ম্যাক্সিম্ গোর্কী একজন অক্লান্ত সৈনিকই থেকে গিয়েছিলেন। যে জীবন সোভিয়েত ইউনিয়নে বিকশিত হয়ে উঠছিল তিনি শুধু তাইই দেখেননি, পুঁজিবাদী সমাজের দুঃখ-দুর্দশা ও গ্লানিও তিনি সবসময়েই সমানভাবেই দেখেছেন এবং এক ক্লান্তিহীন শক্তি নিয়ে সেসব কিছুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি সবসময়েই আমাদের সাহায্য করেছেন। তিনি ছিলেন এমনই একজন ব্যক্তি যাঁর পক্ষেই একমাত্র সম্ভব হয়েছিল বিদেশী বুদ্ধিজীবীদের এই বলে চ্যালেঞ্জ জানানো! "হে, সংস্কৃতির প্রভুগণ! আপনারা কাদের পক্ষে?" তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি মনস্থির না করে উঠতে পারা, দোদুল্যমান, হাতড়ে-বেড়ানো, চিন্তামগ্ন কবি ও চিন্তাবিদ্দের কাছে আহ্বান রেখেছিলেন দোদুল্যমানতাকে ঝেড়ে ফেলতে, তাঁদের নিজেদেরই স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের সাথী হতে। সেই সমস্ত ব্যক্তিত্ববাদী বুদ্ধিজীবী যাঁরা সমাজতন্ত্রকে ভয় করত এই জন্য যে তা' নাকি তাঁদের ব্যক্তিত্বকে শৃঙ্খলিত করতে পারত, তাঁদেরকে তিনি গভীর ধৈর্য ও আবেগভরে বুঝিয়েছিলেন যে সমাজতন্ত্র নয় পুঁজিবাদই তাঁদের শৃঙ্খলিত করে রাখে উল্টে সমাজতন্ত্রই মানুষের মধ্যকার সমস্ত

সৃজন-শক্তিকেই মুক্ত করে দেয়, সমাজতন্ত্রই ব্যক্তি-মানুষের মুক্তি ঘটায় জীবনের পরিপূর্ণতার দিকে।

"মানুষের ওপর শ্রেণী-সমাজের চাপ, বাইরের চাপই ব্যক্তিত্ববাদের জন্ম দেয়। আর ব্যক্তিত্ববাদের সাহায্যে ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা হোল নিজেরই বিরুদ্ধে উদ্যত হিংসাকে মোকাবিলা করার এক নিছক বন্ধ্যা প্রয়াস। আত্মরক্ষা ব্যাপারটা আসলে আত্ম-সীমিতকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ আত্মরক্ষার অবস্থায় বুদ্ধিজীবীসুলভ শক্তির বিকাশ প্রক্রিয়াটাই মন্দীভূত হয়। এধরণের একটা অবস্থা সমাজ ও ব্যক্তি-মানুষ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। ঘটনা এই যে, জাতিগুলো হাজার হাজার বিলিয়ন খরচ করে থাকে শুধুমাত্র প্রতিবেশী জাতিদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য, আর শ্রেণী-সমাজের আক্রমণগুলোর বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করতেই ব্যক্তিদের শক্তি-সামর্থ্যের একটা বিরাট অংশেরই অপচয় হয়ে থাকে। "জীবন একটা সংগ্রাম!" হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু তা' হোল প্রকৃতির মৌলিক শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে মানুষ ও মানবজাতির সংগ্রাম, তাদের ওপর আধিপত্য কায়েম করার সংগ্রাম। আর শ্রেণী-সমাজ এই মহৎ সংগ্রামটাকে, স্বীয় দাসত্বের জন্য মানুষের ভেতরের দৈহিক শক্তির ওপর আধিপত্য কায়েম করার এক জঘন্য লড়াইয়ে অধঃপতিত করেছে।

এরকম অনেক পরিষ্কার কথাই পুঁজিবাদী দুনিয়ার বুদ্ধিজীবীদের লক্ষ্য করে ম্যাক্সিম্ গোর্কী বলেছেন। আর যেহেতু একজন মহৎ সাহিত্যিকের কর্তৃত্ব তাঁর নিজের পেছনে ছিল, সেজন্য অনেকের চেয়েই অনেক সহজভাবে ও সার্থকভাবে হাজার হাজার বুদ্ধিজীবীকে তিনি এসব বোঝাতে পেরেছেন। একথাটা ঠিক যে, সৃষ্টি ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে কার্যকরী উপাদানসমূহ সংগ্রহের স্বার্থে নতুন কোন কিছুকে খুঁজে বের করার প্রয়োজনে সোভিয়েত জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের অনুশীলনের গভীরে যদিও তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন; তবুও শ্রমিকশ্রেণীব বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থে, স্রষ্টা ও নির্মাতারূপে ব্যক্তি-মানুষের প্রকৃত মুক্তির স্বার্থে, আমাদেরই সার্বিক স্বার্থে সবসময়েই আমাদের সঙ্গে একসাথে লড়াই করে গেছেন।

গোর্কীকে হারানো আমাদের সবাইয়ের কাছেই এক বিরাট ক্ষতি। আর সেজন্যই সত্য বলে একে মেনে নিতে আমাদের এত সময় লাগছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন এটা একটা সত্যই, তখন আমরা একথাই ঘোষণা করতে চাই যে, সেই প্রাণময় কমরেডটির প্রতি সমগ্র ভালবাসায় অবশ্যই তাঁর কাজের পথেই আমরা অবিচলিত থাকব, আমরা এমনভাবেই কাজ করে যাব যা'তে করে তাঁকে হারানোর অপূরণীয় ক্ষতিকে আমরা পূরণ করতে পারি। আমরা সেভাবেই কাজ

করে যাব, সৃষ্টি করে যাব, যেমনভাবে তিনি আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতেন—দীর্ঘ, ঋজু, আর অকল্পনীয় সুন্দর চোখজোড়ার সামনে দূরে অনেক দূরে প্রসারিত করে দিতেন তাঁর দৃষ্টিকে। তাঁর মত আমরা অবশ্যই জীবনকে ভালবাসব, আর তাই, জীবনের সমস্ত বুর্জোয়া গ্লানি ও অবদমনের বিরুদ্ধে থাকবে আমাদের ঘৃণা ; আমরা অবশ্যই লড়াই করে যাব।"

"চিল্‌ড্‌ হ্যারলড্‌স্‌ পিলগ্রিমেজ্‌"-এর মুখবন্ধে বায়রণ

আজকের দিনের প্রতি বায়রণের বাণী

বাইশে জানুয়ারী, মহান ইংরেজ কবি লর্ড বায়রণের একশ' পঞ্চাশতম জন্মদিনে সমস্ত পৃথিবী তাঁকে স্মরণ করছে। কতভাবেই না তাঁকে স্মরণ করা হচ্ছে! কেউ কেউ প্রশংসা করছে তাঁর কবিতার গীতিময়তাকে আবার কেউ কেউ এর ঠিক বিপরীতটাই করছে, তবে এটা ঠিক যে কোন বিচার বুদ্ধির মাপকাঠিতে কিছুই করা হচ্ছে না। কেউ কেউ একথাও বলছে যে চিরায়ত গঠন-শৈলীর প্রতি নাকি বায়রণ অতিমাত্রায় নির্ভরশীল ছিলেন; আর যেহেতু কবির মৃত্যুর সময় থেকে উত্তরকালের জীবনে গীতিময়তা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, সেজন্য কোন বিচারবোধের ধারে কাছে না গিয়েই এ থেকেই তারা এসব কিছু নির্ধারণ করে ফেলেছে। আর সর্বোপরি দুনিয়া (এবং খুবই দুষ্প্রাপ্য এক ঐক্যমতের ওপর দাঁড়িয়ে সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্র জগৎ) মনে রেখেছিল এই সুপুরুষ লর্ডের ভালবাসার বিষয়ে যত সব মুখোরোচক গুজব। যেটা ইংরেজ সমাজের সবচেয়ে পরিশীলিত অংশ বলে পরিচিত, সেই অংশটাই বায়রণের ওপর জড়ো করেছিল সেই সব গুজবের পাহাড়; শুধুমাত্র একটা উদ্দেশ্যেই তারা এটা করেছিল, আর তা' হোল, স্বাধীনতার প্রতি বায়রণের ভালবাসা; সেই মহান ও একমাত্র ভালবাসার জন্য বায়রণের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া।

সেই প্রতিক্রিয়ার কালে, মধ্য ইউরোপে যে প্রতিক্রিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন মেত্তারনিখ্‌ অবশ্যই তা' ছিল এক বিপজ্জনক ব্যাপার। আর আজ, সমকালীন মেত্তারনিখ্‌-এর বিরুদ্ধে মহান আন্দোলনের সময়ে, এই ভালবাসার যুক্তিতেই বায়রণকে সবচেয়ে বেশী প্রাণময়, সবচেয়ে বেশী সজীব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলা চলে।

ব্যাঙেরা যেমন ডাকতে পারলেই খুশী হয়ে থাকে, বায়রণ সেই রকম স্বাধীনতার প্রত্যাশী ছিলেন না; মানব জাতির প্রকৃত মুক্তির মহান আদর্শই ছিল

তাঁর কাছে স্বাধীনতার আদর্শ আর সেই আদর্শের প্রতি আনুগত্যের স্বার্থেই সম্পূর্ণ সচেতনভাবে তিনি তার কাব্যকৃতিকে সেদিকেই ফিরিয়ে রেখেছিলেন এবং একেই প্রতীকী-বিন্যাসে তিনি প্রকাশ করেছিলেন সেই মৌলিক মুখবন্ধে, যা' তিনি লিখেছিলেন তাঁর প্রথম মহান গ্রন্থ 'চিল্ড্ হ্যারলড্স্ পিলগ্রিমেজ্'-এর প্রথম স্বর্গের একেবারে শুরুতেই।

১৮০৯ সালের ২২শে জানুয়ারী ব্রিটিশ আইনের সাবালোকত্বের বয়স-সীমা অতিক্রম করলেন বায়রণ; আর অবিলম্বেই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় লালিত মানুষের খোঁজে বিদেশে পাড়ি দিলেন বায়রণ। জুনের এগার তারিখে তিনি ইংলণ্ড ছেড়ে চলে গেলেন। প্রথম যাত্রায় গিয়ে পৌঁছলেন স্পেনে, যেখানে জনগণ লড়াই করছিল ফরাসী দখলদার, ব্রিটিশ হস্তক্ষেপকারী ও নিজেদের দেশের অভিজাত বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে।

সেখানেই 'চিল্ড্ হ্যারল্ড্'-এর প্রথম স্বর্গের অন্তর্গত প্রথম কবিতাটা জন্মলাভ করল। ১৮১২ সালে ব্রিটেনে ফিরে এসে এর প্রথম দু'টো স্বর্গকে তিনি ছাপতে দিলেন আর সেগুলো ছেপে বেরুবার আগেই হাউস্ অব্ লর্ডস্-এর সদস্য হিসাবে বায়রণ বক্তৃতা করলেন। আর তাঁর বক্তৃতার বিষয়টাই বা কি ছিল! তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন লুডাইটদের ওপর, ব্রিটিশ শ্রমিক ও কারিগরদের সেই আন্দোলনের ওপর, নটিংহামের তাঁতিদের সেই আন্দোলনের ওপর, যারা পুঁজিবাদী ব্যবসায় সংগঠনের যন্ত্রপাতিগুলো ভেঙ্গে ফেলেছিল কারণ, তাদের অনেকেই মনে করত যে তাদের দুঃখ-দুর্দশার উৎসই হোল ওগুলো। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটা আইন প্রস্তাবিত হোল, আর তার অর্থ দাঁড়াল লুডাইটদের জন্য মৃত্যুদণ্ড। ঐ আইনটার বিরুদ্ধে হাউস্ অব্ লর্ডস্-এর সদস্য হিসাবে বায়রণ বক্তৃতা দিয়েছিলেনঃ

"মহামান্য লর্ডেরা!" বক্তৃতায় তিনি বললেন, "...মাননীয় অপরাধীরা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার উপায় বার করতে পারেন, কিন্তু হতভাগ্য শ্রমিকরা যখন অপরাধ করতে বাধ্য হয় তখন তাদের জন্য নতুন ও ভয়ানক সব শাস্তিকে উদ্ভাবন করতেই হয়, নতুন নতুন মৃত্যুফাঁদকে তো চারদিকে ছড়িয়ে দিতেই হয়! ঘটনাটা এইরকম যে, এইসব লোকেরা মাটি খুঁড়তে চায়, অথচ কোদালটা থাকে অন্যদের হাতে; তারা ভিক্ষে চাইতে এতটুকু লজ্জিত নয়, কিন্তু তাদের স্বস্তি দেবার কেউই থাকে না; বেঁচে থাকার উপায়গুলো থেকে, তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় আর অন্য সমস্ত জীবিকা আগে থেকেই ভর্তি হয়ে থাকে; তাই তাদের এই বাড়াবাড়ি যত নিন্দাই ও দোষনীয়ই হোক না কেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বলা হচ্ছে যে, যারা নাকি সাময়িকভাবে ফ্রেমগুলোর মালিক ছিল, তারাই নাকি ওগুলো

ধ্বংস করেছে, কিন্তু তদন্তে যদি এটা প্রমাণিতও হয়, তবুও অপরাধের বৈষয়িক কারণগুলোই শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে মূলধন হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

"... এদেরকে আপনারা বলছেন বিশৃঙ্খল জনতা, বলছেন মরীয়া, বিপজ্জনক, মূর্খ এক জনতা ; আপনারা ভাবছেন যে এই উত্তেজিত মারমুখী মূর্খ জনতাকে শান্ত করার জন্য এদের কয়েকটা নেতৃত্বকারী মাথাকে ছেঁটে ফেলতে হবে ... কিন্তু জনতার প্রতি আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা কি সচেতন? এ হচ্ছে সেই বিশৃঙ্খল জনতা, যারা আপনাদের ক্ষেতে-খামারে পরিশ্রম করে, আপনাদের গৃহে কাজ করে, আপনাদের নৌবহর ও সেনাবাহিনীকে পরিপুষ্ট করে এবং এভাবেই এরা পৃথিবীটাকে তোয়াক্কা না করতে আপনাদের সক্ষম করে তোলে, আর যখন অবহেলা ও দুর্বিপাক এদের মরীয়া করে তোলে, তখন এরাই আপনাদের আর তোয়াক্কা করে না। আপনারা হয়ত এদেরকে বিশৃঙ্খল জনতা বলতে পারেন, কিন্তু ভুলে যাবেন না যে, এই বিশৃঙ্খল জনতাই অনেক সময় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করে থাকে। আর এখানে আমি অবশ্যই একথা না বলে পারছি না যে দারুণ চকিতেই না আপনারা বিপর্যস্ত মিত্র-রাষ্ট্রের সুরক্ষার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন আর পেছনে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন আপনাদের স্বদেশের দুর্দশা-পীড়িত জনগণকে ধর্মযাজকদের করুণার ছত্রচ্ছায়ায়। ... তদন্ত ছাড়াই একথা আমি বলতে পারি যে পর্তুগালের পেছনে যদি আরও কিছু টাকা কম ব্যয় করা হোত ও পর্তুগালের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্যটা যদি আর একটু কম দেখান হোত এবং এদের চাকরীতে পুনর্বহাল করা হোত, তাহলে অন্ততঃ বেয়নেট ও ফাঁসির এত বাড়াবাড়ির প্রয়োজন হোত না। অথচ ঘরোয়া স্বস্তির সম্ভবনাকে নিকেশ করে দেবার জন্য নিঃসন্দেহে আমাদের মিত্রদের বড় বেশী বৈদেশিক দাবী-দাওয়া রয়েছে, যদিও কখনই এরূপ দাবীর কোন যৌক্তিকতাই থাকতে পারে না। যুদ্ধ-বিক্ষত সাগর পাড়ের ভূখণ্ডে ঘুরে বেড়িয়েছি আমি, তুরস্কের সবচেয়ে বেশী নিপীড়িত প্রদেশগুলোতে থেকেছি আমি, কিন্তু কোন বিধর্মী দস্যু-সরকারের অধীনেও আমি কখনও এ ধরণের অনৈতিক অধঃপতিত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিনি যা' এক খ্রীষ্টীয় দেশের একেবারে অন্তঃস্থলে ফিরে এসে অবধি আমি প্রত্যক্ষ করছি। আর আপনাদের দাওয়াইগুলোই বা কি? মাসের পর মাস ব্যাপী নিষ্ক্রিয়তা, তারপর মাসের পর মাস ব্যাপী সেই নিষ্ক্রিয়তার চেয়েও খারাপ এক দারুণ সক্রিয়তা, আর শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় চিকিৎসকরা বার করে ফেলল সেই আজব দাওয়াই, যা' দ্রাকোর সময় থেকে আজ পর্যন্ত তারা বার করে আসছে। রোগীর নাড়ী টিপে নিজেরা মাথা ঝাঁকিয়ে তারা সেই চিরাচরিত প্রেসক্রিপশনটাই ঝাড়ল—গরম জল ও

রক্তপাতের প্রেসক্রিপশন্ আর গরম জলের অর্থ আপনাদের বাঁদরামির নীতি আর রক্তপাতের অর্থ আপনাদের সেনাদের ছুরির ফলায় রক্ত ঝরানো। আর সাধারণতঃ যা' হয়ে থাকে সেভাবেই নিশ্চয়তার সংগে এই শারীরিক খিঁচুনী অবশ্যই মৃত্যুতে পরিণতি লাভ করবে। বিলটার অন্যায্য ও অক্ষম দিকগুলোকে বাদ দিলেও, আপনাদের পদমর্যাদার পক্ষেও শাস্তিটা যথেষ্ট গুরুভার নয়কি? আপনাদের দণ্ডবিধির গায়ে কি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট রক্তের ছোপ পড়েনি এবং স্বর্গের পথে পা বাড়াবার জন্য আরও রক্ত কি তা'তে ঢা'তে হবে?

একটা গোটা দেশকে কি আপনারা কারাগারে পরিণত করবেন? সমস্ত ক্ষেত্-খামারেই কি আপনারা ফাঁসির মঞ্চ তৈরী করবেন আর কাগ্‌তাড়ুয়ার মত মানুষগুলোকে তাতে ঝুলিয়ে রাখবেন? আর এই পদক্ষেপগুলো কার্যকরী করতে যা' করতে হয় আপনারা কি তাই করবেন? অর্থাৎ সবকিছুকে ধ্বংস করে, গোটা দেশটাকে সামরিক আইনের তলায় চেপে ধরে, জনবসতিতে ছেঁটে ফেলে, চারদিকে আবর্জনার স্তূপ গড়ে তুলে আর রাজকীয় মৃগয়ায় রাজমুকুটের প্রতি উপহার হিসাবে ও বেআইনীদের জন্য শেরউড্ গাছের অরণ্যকে পুনঃস্থাপিত করে আপনারা কি এগুলো করতে চান? উপবাসক্লিষ্ট মরীয়া জনগণের জন্য এগুলো কি কোন প্রতিকার? দুর্ভিক্ষ-পীড়িত সেই হতভাগ্য মানুষগুলো, যারা আপনাদের বেয়নেটকে পরোয়া করেনি ফাঁসির মঞ্চ গড়ে কি তাদের আপনারা ভয় পাওয়াতে পারবেন? সেই একমাত্র স্বস্তি যা' আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন, আর তা' হোল এক নির্লিপ্ত শান্তি, তাই নয়কি? তবে যা' আপনাদের গ্রেনেড্‌ধারী সৈনিকরা করতে পারেনি তা' কি আপনাদের জল্লাদরা করতে পারবে? আর আইনের চৌহদ্দির মধ্যেই যদি আপনারা চলতে চান তবে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাবেন কোথা থেকে? দ্বীপান্তরে দণ্ডভোগ করতে পাঠানোটাই ছিল যখন শাস্তি, তখনই যারা নিজেদের লোকজনদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেছিল, তারা কিভাবেই বা আজ তাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে প্রলুব্ধ হ'তে পারে যখন শাস্তি মানেই হোল মৃত্যুদণ্ড ···।"

হাউস্ অব লর্ডস্-এ বায়রণের ঐ বক্তৃতার কয়েকদিন পরেই 'চিল্ড্ হ্যারলড্'-এর প্রথম দু'টো স্বর্গ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতীকের সাহায্যে ও প্রদর্শনমূলকভাবে বায়রণ ঘোষণা করেছিলেন যে, নটিংহামের তাঁতিদের রক্ষায় তাঁর সেই বক্তৃতাটাই ছিল 'চিল্ড্ হ্যারলড্'-এর মুখবন্ধের গদ্যরূপ।

পরিষ্কার ও ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি কাব্য-সৃষ্টিকে তার সময়ের জ্বলন্ত সমস্যাগুলোর সংগে সংগ্রথিত করেছিলেন এবং তাঁর সমগ্র জীবন ধরেই তিনি তা'

করে গিয়েছিলেন। এমনকি তাঁর মৃত্যুটাও এই ব্যাপারে ছিল সত্যিকারের প্রতীকী তাৎপর্যমণ্ডিত। জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে গ্রীক যোদ্ধাদের সারিতে লড়াই করতে করতে একজন স্বেচ্ছাসৈনিক হিসাবে অত্যন্ত তরুণ বয়সে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বায়রণ। বায়রণ সেখানেই লড়াই করেছিলেন, যেখানে চলেছিল স্বাধীনতার যুদ্ধ আর সেখানেই তাঁর নিজের স্থান খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি, খুঁজে পেয়েছিলেন মহান কবিদের জন্য নির্দিষ্ট সেই স্থান।

ডক্টর গোয়েবল্‌স্‌-এর উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি

চেক্‌ বুদ্ধিজীবীদের উত্তর

ন্যাশনাল সোস্যালিজম্‌-এর প্রচারমন্ত্রী ও রাজসভার বিদূষক গোয়েবল্‌স্‌, চেক্‌ বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে কয়েকজন বেছে নিয়েছেন, আমন্ত্রণ করে তাদের জার্মানীতে নিয়ে গেছেন এবং যা' তিনি দেখাতে চেয়েছেন তাদের তাই দেখিয়েছেন। আর তাঁদের এই প্রদর্শনীমূলক যাত্রার অর্থটা সবশেষে তাঁদের জানিয়েছেন। তাঁদের কাছে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছেন তা'তে ঘুষের প্রলোভন ও ভীতি-প্রদর্শন, দু'টোকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রেখেছেন। আর বক্তৃতাটা তিনি শুধুমাত্র তাঁদের উদ্দেশ্যেই দেননি, সমগ্র চেক্‌ বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যেই তিনি তা' দিয়েছেন। বক্তৃতায় তিনি বলেছেন যে, এখনও নাকি সময় আছে যা'তে করে চেক্‌ জাতি দেখাতে পারে যে, "স্বেচ্ছায় ও খুশীমনে তারা জার্মান ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে, না তাদের আভ্যন্তরীণ রক্ষা ব্যবস্থাকে তার বিরুদ্ধে দাঁড় করাবে।" তিনি বলেছেন যে সেই অনুসারেই সম্মানজনক মিত্রতা অথবা মুখোমুখি সংঘর্ষ এই দু'টোর একটা রাস্তা জার্মানী বেছে নেবে। তিনি বলেছেন যে, এটা নাকি বুদ্ধিজীবীদের ওপরই নির্ভর করছে। বেশ জোর দিয়েই তিনি বলেছেন যে, বুদ্ধিজীবীদের ওপরই এটা নির্ভর করছে যে চেক্‌ জাতি কোন্‌ পথ বেছে নেবে কারণ একটা জাতির চিন্তাধারা সব সময়েই সেই জাতির নেতৃত্বকারী চিন্তাবিদ্‌দের ওপরই নির্ভর করে।

চেক্‌ জাতির সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিরোধকে ভেঙ্গে দিতে তারা নানাভাবেই চেষ্টা করেছে এবং তারা কখনই সফল হ'তে পারেনি। চেক্‌ তরুণদের জয় করে নেবার চেষ্টা করেছে তারা, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। চেক্‌ শ্রমিকদের জয় করে নিতেও তারা চেষ্টা করেছে, কিন্তু চামড়া বাঁচাতে তাদের দালালরা ফ্যাক্টরী ও ওয়ার্কশপ্‌ ছেড়ে কোনরকমে ছুটে পালিয়েছে। সুতরাং এখন তারা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে চেক্‌ বুদ্ধিজীবীদের মারফৎ চেক্‌ জাতির মূল শরীরে ঢুকে পড়তে।

'আমাদের সেবায় লেগে পড়', কথাগুলো গোয়েবল্‌স্‌ খুব সোজাসুজিই বলেছেন। বলেছেন হাত ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে চুক্তি পাকা করার ব্যবসাদারী ভঙ্গীতে— "তোমাদের সুবিধাই হবে এতে, আমাদের সেবায় লেগে পড়। যদি তোমাদের

আমরা পেয়ে যাই, তবে গোটা জাতিটাকেই আমাদের হাত থেকে খুঁটে খেতে বাধ্য করা যাবে। একটা জাতির ধ্যান-ধারণা বলতে তাই বোঝায় যা' তার চিন্তাবিদ্‌রা বহন করে থাকে। আরও বাছাই করা কথায় বলতে গেলে অর্থাৎ আরও সংক্ষেপে বলতে গেলে: যদি তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা কর তবে গোটা জাতির প্রতিই তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে।"

এই জঘন্য প্রস্তাব, এই নোংরা অপমান, যা' চেক্ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি করা হয়েছে, তা' অবশ্যই উত্তরের প্রত্যাশা রাখে। এর উত্তর রয়েছে আমাদের নিজেদের কাছে, আমাদের সম্মানের কাছে ; এর উত্তর রয়েছে আমাদের জাতির কাছে, সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির কাছে, সমস্ত ব্যক্তির কাছে, যাদের সঙ্গে স্বাধীনতার স্বার্থে জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের সামনের সারিতে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমরা, চেক্ সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা, লেখক, বিজ্ঞানের স্নাতক ; আমরা, যাদের মুখ জোর করে স্তব্ধ করে দিয়েছে তোমাদের সেন্সর-ব্যবস্থা, তোমাদের ত্রাস বেঁধে রেখেছে যাদের হাত ; আমরা, যাদের হাজারে হাজারে অমানবিক নির্যাতন ভোগ করতে হচ্ছে তোমাদের কয়েদখানায় তোমাদের কন্‌সেন্‌ট্রেশন্ ক্যাম্পে ...

ডক্টর গোয়েবল্‌স্, আমরা, চেক্ বুদ্ধিজীবীরা তোমার প্রস্তাবের জবাব দিচ্ছি:

না, কখনই না! তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? না, কখনই চেক্ জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করব না, তোমাদের সেবায় কখনই আমরা যোগ দেব না, অন্ধকার ও অধীনতার কখনই আমরা সেবা করব না।

আমাদের কাছ থেকে কি চাও তুমি? তুমি কি চাও যে চাতুরীপূর্ণ সেই প্রচার, যার প্রতিটা শব্দই মিথ্যা, তাকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিই ; আর সৎ কাজের বিনিময়ে যে সুনাম আমরা অর্জন করেছি, তা' দিয়ে তোমার ঐ প্রচারকে সত্যের আকার দিই ; আমাদের ওষ্ঠ ও কলমকে তোমার ঐ চাতুরীর কাছে আমরা ধার দিই, আমাদের অর্পিত আমাদের জাতির আস্থার আমরা অপব্যবহার করি, আমাদের জাতিকে এমন এক পথ বাত্‌লে দিই যা' তাকে যন্ত্রণাদীর্ণ মৃত্যুতে পৌঁছে দেয়। না, আমরা তা' করতে পারি না। আমরা তা' করব না।

আমাদের কাছ থেকে কি চাও তুমি? তুমি চাও যে, তোমাদের রক্তাক্ত ত্রাসের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করি ; তোমাদের গেস্টাপোদের পাশে তাদেরই পঙ্‌ক্তিতে আমরা আমাদের স্থাপন করি ; গেস্টাপোরা যেভাবে শারীরিক দিক দিয়ে চেক্ জনগণকে হত্যা করছে সেভাবেই চেক্ জনগণের হৃদয়কে আমরা হত্যা করি ; চেক্ জনগণের গর্বোজ্জ্বল ও আশ্চর্যময় প্রতিরোধ, যা'কে দুর্বল করে দিতে

ব্যর্থ চেষ্টাই তোমরা করে চলেছ, সেই প্রতিরোধকে ভাঙতে তোমাদের হামলা-বাজদের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করি। না, আমরা তা' করব না। আসলে আমাদের কাছ থেকে কি চাও তুমি? তুমি কি চাও যে আমরা আত্মহত্যা করি? তাহলে জেনে রাখ, অবশ্যই তা'ও আমরা করব না।

তোমার কথানুসারে, আমরা, 'জাতির নেতৃত্বকারী চিন্তাবিদ্'রা, আমাদের দেশের জনগণের সঙ্গে প্রকৃতই এক গভীর ও অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। আর এই বন্ধন গড়ে উঠেছে এই জন্য নয় যে আমাদের ধারণা তাদের ওপর আমরা জোর করে চাপিয়ে দিই, বরঞ্চ এই জন্য যে তাদের চিন্তাধারাকেই আমরা প্রকাশ করে থাকি। আমরা, সংস্কৃতি-জগতের ব্যক্তিরা, আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে জীবনে মৃত্যুতে চিরদিনের জন্য সংযুক্ত হয়ে রয়েছি, আর আমরা তা' জানিও। অতীতের প্রতিটা যুগ, যা'তে চেক্ বুদ্ধিজীবীরা ছিল সত্যিকারের নেতৃত্বকারী চিন্তাবিদ্দের স্তর, চেক্ সংস্কৃতির সেই মহান পর্বগুলোতে সমস্ত শ্রেষ্ঠ নামগুলোই মানব-প্রগতির সবচেয়ে বলিষ্ঠ চিন্তাধারার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। তাদের নাম বুকের গভীরে নিয়েই আমাদের জনগণ লড়াই করেছিল, দুঃখ-কষ্টের শিকার হয়েছিল। দুঃখ-কষ্টের শিকার হয়েছিল তারা, কিন্তু নিঃশেষ হয়ে যায়নি, কখনই সেইসব নামকে তারা পরিত্যাগ করেনি।

"মানুষের স্বাধীনতার জন্য—এই ধারণাটা আমাদের মধ্যে যখন পুষ্পিত হয়, সেই সুদূর অতীতে, চেক্ জাতি যেভাবে দাঁড়িয়েছিল আজকেও সেভাবেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ; এই প্রতীতি যা' সেদিন কবরের মধ্যেও আমাদের নাড়া দিয়েছিল, আজও সেভাবেই তা' গৌরবের পথে আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে, এগিয়ে চলার পথে নেতৃত্ব দিচ্ছে!"

ডক্টর গোয়েবল্স্, একজন চেক্ কবি কথাগুলো লিখেছিলেন। এভাবেই কয়েক বছর আগে, আমাদের সবাইয়ের পক্ষ থেকে, আমাদের সবাইয়ের জন্য, আমাদের জনগণের জন্য সেই চেক্ কবি বলে গেছেন সেই একমাত্র পথের কথা যা' স্বাধীনতা অর্জন ও জাতীয় অস্তিত্ব সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছে দিতে পারে। তোমাদের নিপীড়নের স্বার্থে বিশ্বাসঘাতকতার পথ এটা নয় ; এ পথ হোল আমাদের দেশে, তোমাদের দেশে, সমগ্র ইউরোপে মানবিক স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের পথ, সংগ্রামের পথ। আর এর প্রতি আমরা বিশ্বস্ত থাকবই।

চেক্ ইতিহাসের অনেক পাতাই ভরে রয়েছে চেক্ অভিজাতদের রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতায়। সেই সব স্বৈরাচারীরা শুধুমাত্র তাদের সম্পদ ও মুনাফা বাড়ানোর স্বার্থে চেক্ জনগণের স্বাধীনতা, এমনকি জাতির জীবনধারাকেও বিক্রি

করে দিয়েছিল। কিন্তু তা'তে তুমি একটা পাতাও খুঁজে বার করতে পারবে না যেখানে চেক্ সংস্কৃতির রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতার কোন ছাপ পড়েছে। আর তোমাকে আমরা এ বিষয়ে সুনিশ্চিত করতে পারি যে আমাদের ইতিহাসে আমরা আর তা' যোগ হতে দেব না।

"ঝড় ও পীড়নের দিনগুলোতেই আমাদের জন্ম। আর সেই ঝোড়ো মেঘের মধ্য দিয়েই পায়ে পায়ে হেঁটে চলেছি আমরা, হেঁটে চলেছি আমাদের সেই গর্বিত ও মহৎ লক্ষ্যের দিকে, একমাত্র জনগণের প্রতিই আমরা নুইয়ে রেখেছি আমাদের ঘাড়।"

ডক্টর গোয়েবল্‌স্, এটাও একজন চেক্ কবির রচনা। আমরা হচ্ছি সেই জাতির বুদ্ধিজীবীরা, যে জাতি শতাব্দী-ব্যাপী চূড়ান্ত নিপীড়নের মধ্যেও বেঁচে রয়েছে, নিঃশেষ হয়ে যায়নি, কারণ এ জাতি কোনদিনই নতজানু হয়নি। আমরা হচ্ছি এরূপ এক জনগণের রক্তের রক্ত, আর এসত্ত্বেও তুমি একথা ভাবছ কি আমরা তোমার সামনে নতজানু হ'ব ? নির্বোধ !

কিন্তু তুমি আমাদের কিছু 'সুবিধা' দেবার কথা বলছিলে। সত্যিই, তাই নাকি ? "যখন এই প্রশ্নগুলোর মীমাংসা হয়ে যাবে (অর্থাৎ চেক্ বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বাসঘাতকতার কাজটা চলতে থাকবে) তখন চেক্ চলচ্চিত্রের জন্য অতুলনীয়ভাবে বড় এক বাজার খুলে যাবে ··· চেক্‌রা একটা সুযোগ পাবে যা'তে করে তারা তাদের চলচ্চিত্র, সাহিত্য ও সঙ্গীতকে রপ্তানি করতে পারে।" তুমি কি সেই কথাই বলছিলে ? হ্যাঁ, তুমি নিশ্চয়ই সেই কথাই বলছিলে। স্প্রী নদীর তীর থেকে আসা চেরা-খুরের বেচারা লোরেলেই ! আরে, কোথায় তোমার শিকারের যন্ত্রটা ? "পাখী ধরতে হ'লে, তাদের জন্য সুন্দর করে গান গাইতে হয়"—এরকম একটা চেক্ প্রবাদ আছে। তোমরা জানই না কেমন করে সুন্দরভাবে গান গাইতে হয়। আর তা' দিয়েই তোমরা আমাদের ধরতে চাইছ ! তোমরা, তোমাদের মত লোকেরা, যারা, চেক্ চলচ্চিত্রের কর্মীদের কাছ থেকে চুরি করেছ সবচেয়ে নিখুঁত ফিল্ম-স্টুডিওগুলো এবং চেক্ চলচ্চিত্র শিল্প যা'তে করে তার সমস্ত শক্তি নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠতে না পারে সেজন্য এই মুহূর্তেই সেই কাজটাকে অসম্ভব করে তুলেছ, আর সেই তোমারই চেক্ চলচ্চিত্রের রপ্তানির লোভ দেখিয়ে আমাদের ধরতে চাইছ ! তোমাদের মত লোকেরা, যারা আমাদের সাহিত্যের প্রতি বর্বরোচিত আচরণ করেছ, যারা চেক্ সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাগুলোকে বাজেয়াপ্ত করছ নিকেশ করে দিচ্ছ, যারা চেক্ সাহিত্যকে লাইব্রেরীর বাইরে রাস্তায় নিক্ষেপ করছ, এমনকি মাখা'র 'মে'কে পর্যন্ত অসম্মান করছ, সমসাময়িক কবিতার সংগ্রহকে বাজেয়াপ্ত

করছ, ছ'শ' বছরের পুরোনো চতুর্থ চার্লস্-এর জীবনীটাকেও রেহাই দিচ্ছ না, সংক্ষেপে বলতে গেলে, সমস্ত চেক্ রচনাকেই ধ্বংস করতে চাইছ, আর সেই তোমরাই চেক্ সাহিত্যের রপ্তানি করে আমাদের ধরতে চাইছ! তোমাদের মত সব লোকেরা, যারা ক্রমাগত বাঁধা-নিষেধের চাপে আমাদের সঙ্গীত-জীবনকে পঙ্গু করে দিচ্ছ, ভয় দেখিয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ সুরকারদের কাজকে স্তব্ধ করে দিচ্ছ; তোমরা যারা আমাদের গান গাইতে দিচ্ছ না, এমনকি চেক্ জনগণের রচনা করা সঙ্গীতের সেই বইগুলো পর্যন্ত শিশুদের কাছ থেকে তামরা ছিনিয়ে নিচ্ছ, আর সেই তোমরাই চেক্ সঙ্গীতের রপ্তানি করে আমাদের ধরতে চাইছ! আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তোমরা বন্ধ করে দিয়েছ; প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সাজাচ্ছ জার্মান ছাঁচে, সবচেয়ে সুন্দর ইস্কুল-বাড়ীগুলো তোমরা দখল করে নিয়েছ, লুণ্ঠন করেছ; তোমরা দখল করে নিয়েছ রঙ্গমঞ্চ সঙ্গীতগৃহ ও প্রদর্শনী-কক্ষগুলো; তোমরা তছনছ করে দিচ্ছ আমাদের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, অসম্ভব করে তুলছ বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম; সাংবাদিকদের পরিণত করছ প্রাণশক্তিবিহীন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে; হাজার হাজার সাংস্কৃতিক কর্মীর অস্তিত্বকেই ধ্বংস করছ, ধ্বংস করে দিচ্ছ সংস্কৃতির সমগ্র ভিত্‌টাকেই; ধ্বংস করে দিচ্ছ এরকম সবকিছুই যা' একটা জাতির চিন্তাশীল অংশকে প্রস্তুত করে থাকে; আর ঠিক তখনই সেই বিশেষ অংশটার কাছ থেকে তোমরা সাহায্য প্রত্যাশা করছ যা'তে করে এই উদ্ভট পাগলামির রাজত্বটাকে টিঁকিয়ে রাখা যায়। মশাই, "স্থূল পরিহাসের জবাব একটা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত", আর, এভাবেই একজন মহান জার্মান নাট্যকারের কথাতেই আমরা এর উত্তর দিতে পারি।

হ্যাঁ, সেই জার্মান নাট্যকারদের কথাই বলছি, যাদের নাটক তোমাদের মঞ্চে আর অভিনীত হয় না, এবং এটাই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে ফুটিয়ে তোমাদের বর্তমান অবস্থার রূপটা আর সর্বাগ্রে আমাদের এটাই মনে করিয়ে দেয় যে চেক্ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে নামবার অনেক আগেই তোমাদের জার্মান সংস্কৃতির বিরুদ্ধেই তোমরা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছিলে। জার্মানীর মহান দর্শনের বিজ্ঞানকে তোমরা হত্যা করেছ, তোমাদের দেশ থেকে উৎখাত্‌ করেছ সর্বশ্রেষ্ঠ জার্মান বিজ্ঞানীদের; সর্বশ্রেষ্ঠ জার্মান কবি ও লেখকদের তোমরা তাড়া করে বেড়িয়েছ, অত্যাচারে হত্যা করেছ; মহান জার্মান দার্শনিকদের কাজগুলোকে তোমরা স্তূপ করে পুড়িয়েছ; জার্মানীর আর্ট-গ্যালারীগুলো তোমরা নষ্ট করে ফেলেছ; জার্মান থিয়েটারের গৌরবকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ মাটির ধুলোয়; জার্মানীর ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়েছ তোমরা; জার্মান সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠতম স্রষ্টা হাইনরিখ্‌ হাইনের নাম তোমরা মুছে

ফেলেছ, মুছে ফেলেছ আরও একটু কম শ্রেষ্ঠদের নামও ; গোথে ও শিলারের রচনাবলীকে বিষের ন্যায় উদ্গীরণ করেছ তোমরা ; তোমাদের সংস্কৃতির অঙ্গনটাকে একটা বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে পরিণত করেছ তোমরা ; তোমরা খুন করেছ অথবা স্তব্ধ করে দিয়েছ তোমাদের 'নেতৃত্বকারী চিন্তাবিদ্‌দের অংশটা'কে—আর এখন সেই তোমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছ চেক্-এর নেতৃত্বকারী চিন্তাবিদ্‌দের অংশটাকে যা'তে করে তারা ও তোমাদের এইসব মঙ্গলময় কাজকর্মে অংশ নিতে পারে। আর কেমনভাবেই বা তা' হ'তে পারে ? নিশ্চয়ই তোমাদের আরও বড় শিকারে পরিণত হয়ে ! কারণ, এর বেশী কোন সুবিধা তো তোমরা তাদের দিতে পার না। তাদের গর্দান তোমরা নিয়ে নিতে চাও, অথচ তোমরা চাও তারা স্বেচ্ছায় হাঁড়িকাঠে মাথা দিক। এমন আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ। আমরা তোমাদের এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করছি না।

তোমাদের 'সুবিধা'টা যে কি তা' আমরা বুঝি। তোমার ভয় দেখানোকে আমরা ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখান করছি। তোমার সুদীর্ঘ ব্যক্তব্যের শুধুমাত্র একটা বিষয়কেই আমরা স্বীকার করছি, আর তা' হোল, যে চেক্ জনগণকে ভেঙ্গে ফেলতে তোমরা ব্যর্থ হয়েছ। দেড় বছর ধরে নাল লাগানো বুট পায়ে আমাদের মাটির ওপর দিয়ে তোমরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছ ; আমাদের প্রতিটা পদক্ষেপে তোমরা আমাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছ ; আমাদের পুরুষ, নারী ও শিশুদের দিয়ে জেলগুলো তোমরা ভরে ফেলেছ আর আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের তোমরা হত্যা করেছ। দেড় বছর ধরে আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে তোমরা গলা টিপে হত্যা করতে চেয়েছ ; দেড় বছর ধরে ভয় দেখিয়ে সেই চেষ্টাই করে গেছ যা'তে করে তোমাদের স্বস্তিকার সামনে আমাদের নতজানু করা যায় এবং দেড় বছর ধরে এইসব বিকারগ্রস্থ চেঁচামেচির পর, এমনকি তুমি, নাৎসী প্রচারযন্ত্রের মিথ্যুক মন্ত্রী মহোদয়, এটাই স্বীকার করতে বাধ্য হোচ্ছ যে এতে তোমাদের কোন লাভই হয়নি, অর্থাৎ 'আমাদের আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা'র ব্যাপারটা থেকেই গেছে। হ্যাঁ, আমরা তোমার এই স্বীকৃতিটুকুই মেনে নিই আর এতেই আমরা নিজেদের গর্বিত অনুভব করি। তুমি, নীচ বজ্জাত্, যদি তুমি ভেবে থাক যে আমরা চেক্ বুদ্ধিজীবীরা, চেক্ জনগণের মধ্য থেকে যাদের জন্ম, তারা চেক্ জনগণের চেয়ে কম গর্বিত বা কম চরিত্রসম্পান্ন ; যদি তুমি ভেবে থাক যে তোমার প্রলোভন অথবা ভীতির কাছে পরাভূত হয়ে জনগণ থেকে আমরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলব এবং আমাদের জনগণের বিরুদ্ধে তোমাদের গেস্টাপোদের সারিতে দাঁড়িয়ে যাব, তাহলে পুনর্বার আমাদের জবাবটা শুনে রাখ ঃ

না, না, কখনই না !

আর যদি তুমি জানতে চাও যে নতুন ইউরোপ গড়ায় আমরা অংশ নেব কিনা, তাহলে তার উত্তরে আমরা বলি ঃ "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এবং যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল।"

অবশ্যই তা' হবে অন্য একটা ইউরোপ, যে ইউরোপের কথা তুমি বলছ তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তোমার 'নতুন শৃঙ্খলা'র ব্যাপারটা পুরোনো বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়, তোমার লক্ষ লক্ষ শিকারের রক্ত তার শরীরে ঢুকিয়ে তাকে চাঙ্গা করে রাখা হয়েছে মাত্র। আর এজন্যই আমাদের প্রতি তোমার এত তাড়াহুড়ো। তাই "খুব বেশী দেরী হয়ে যাবার আগেই" তুমি চাইছ যে আমরা তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াই, স্বেচ্ছায় দাঁড়াই। কিন্তু কার জন্য খুব বেশী দেরী হয়ে যাবার কথা বলছ তুমি? তোমার জন্য!

আর যে মুহূর্তে এই ধৃষ্টতা-ভরা আহ্বান তুমি রাখছ, তখনই তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, তোমরা মেতে উঠেছ এক যুদ্ধে, এক দস্যুতার যুদ্ধে ; তোমরা সফল হোচ্ছ, তোমরা জিত্‌ছ, তোমরা এগিয়ে চলছ, দখল করছ, গুলি করছ, বোমা ফেলছ, ডুবিয়ে দিচ্ছ। আর এসব কিছুর ফল কি হচ্ছে? প্রতি মুহূর্তেই আরও বেশী বেশী করে এটাই তোমাদের কাছে পরিষ্কার হ'য়ে যাচ্ছে যে সেই লক্ষ্যবস্তুটা যার জন্য তোমরা যুদ্ধ করে চলেছ তা' কতখানি মোহময়। তোমাদের অগ্রগতির প্রতিটা পদক্ষেপের সঙ্গেই তুমি দেখতে পাচ্ছ তোমাদের সেই ঈপ্সিত লক্ষ্যবস্তুটা কিভাবে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সাত সমুদ্র সাত পাহাড়ের আড়ালে। এখন নিশ্চয়ই এই সত্যটা আর তোমার অজানা নেই।

এমন একটা দেশের ওপর তোমরা দখলদারী কায়েম করেছ, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যে দেশটাই একটা শক্ত ঘাঁটি হ'তে পারত। তোমাদের প্রচারকার্যের ফলশ্রুতি হিসাবে বছরের পর বছর ধরে তোমরা যা' গড়ে তুলেছিলে, তার সবকিছুকে তোমরাই ধ্বংস করে ফেলছ ; বছরের পর বছর ধরে এক কৃত্রিম অন্ধত্বে তোমরা জনগণকে আবিষ্ট করে রেখেছিলে, আর আজ তাদেরই চোখ তোমরা খুলে দিচ্ছ ; লক্ষ লক্ষ মানুষের সমস্ত মস্তিষ্ক ও অন্তরগুলোকে তোমরা ভরিয়ে দিয়েছ তোমাদেরই প্রতি তাদের জ্বলন্ত ঘৃণায়, স্বদেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি জ্বলন্ত ঘৃণায় এবং সমস্ত রকমের ফ্যাসিজমের প্রতি জ্বলন্ত ঘৃণায়, তা' সে ফ্যাসিজম্ যে-জামা গায়ে দিয়েই আসুক না কেন। তাদের অন্তরকে তোমরা ভরিয়ে দিয়েছ প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য এক শক্তিশালী দৃঢ় আকাংক্ষায়—আর, এখন এর মধ্য থেকেই তোমাদের সংগঠিত করতে হবে এক 'নতুন' ফ্যাসিস্ত্ ইউরোপকে। তোমরা চারদিকেই খোঁজাখুঁজি করতে পার, উন্মাদের মত খোঁজাখুঁজি করতে পার, কিন্তু

কেবলমাত্র নিজেদের ধ্বংস ছাড়া অন্য কোন কিছুকেই তোমরা সংগঠিত করতে পারবে না। আর এজন্যই তোমরা নিজেরা অথবা তোমাদের এককালের ভাগীদার ও আজকের বিরোধী সেইসব ব্রিটন্‌রা কেউই এই যুদ্ধের সমাপ্তি টানতে পারবে না। গোটা ইউরোপ জুড়ে তোমরা ডেকে এনেছ ভয়াবহ হত্যালীলা, স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে তোমরা যুদ্ধ শুরু করেছ—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা' গোপন সংগঠনের হাতেই শেষ হবে, তা' সে তোমরা চেক্‌, ফরাসী, বেলজিয়, ডাচ্‌, ডেন্‌, নরওয়েজিয়, স্পেনীয়, ইতালীয় জনগণকে এমন কি তোমাদের স্বদেশের জনগণকে যতই তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াও না কেন!

আবার বলছি, না তোমরা নও। আর আজ নিশ্চয়ই এটা তোমাদের জানবার সময় হয়েছে যে, না, তোমরা যারা এই যুদ্ধ ডেকে এনেছ তারা নও; সেই জনগণ, যাদের তোমরা গরু মোষের মত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ, দাসত্বের মানসিকতায় যাদের হৃদয়গুলোকে ভরে দিতে তোমরা নিষ্ফল চেষ্টা চালাচ্ছ, বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ও সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন যে তোমাদের প্রতিটা 'সাফল্য'-এর সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে চলেছে, সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের অমিত-শক্তির সাহায্যে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করবে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে তোমাদের পরিকল্পনাগুলো এবং গড়ে তুলবে সেই ইউরোপ, যে ইউরোপ তাদের মস্তিষ্কে আজ প্রাণময় সজীব, যে ইউরোপে নাৎসীরা থাকবে না, থাকবে না শোষক বদমায়েসরা, যে ইউরোপ হবে স্বাধীন শ্রমের ইউরোপ, স্বাধীন জনগণের ইউরোপ, সত্যিকারের এক নতুন ইউরোপ, এক সমাজতান্ত্রিক ইউরোপ।

চেক্‌ বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিবৃন্দ

পরিশিষ্ট

জুলিয়াস ফুচিক

(১৯০৩–১৯৪৩)

জুলিয়াস ফুচিকের বয়স যখন মাত্র বারো বছর, তখন থেকেই তাঁর স্বাধীন সাহিত্য-প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। যখন তিনি পনের বছরের একজন ছাত্র, তখনই তিনি ছদ্মনামে চেক্ লেখক কারেল চাপেক সম্পাদিত বিদ্রূপ রসের কাগজ 'নেবোজ্‌সা'তে লিখতে থাকেন।

যখন তাঁর বয়স পনের বছর, তখন প্ল্‌জেন্‌-এর শহরতলীতে হাঙ্গেরীয় শিশুদের ওপর গুলিচালনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন ফুচিক। ঐ ঘটনা বালক ফুচিকের

ওপর দারুণ প্রভাব ফেলেছিল। তিনি সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে পড়াশুনা করতে শুরু করেন এবং ১৯২১ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার সদস্যপদ লাভ করেন ফুচিক।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ফুচিক প্রাগে চলে আসেন এবং প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, চেক্ সাহিত্য এবং শিল্প ও সঙ্গীতের ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে এফ. এক্স. সাল্‌দা ও জদেনেক নেজ্জেদ্‌লী দারুণভাবে তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। পড়াশুনা চালানর সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবন ধারণের জন্য তিনি কখনও শিক্ষকতা করতেন আবার কখনও শ্রমিকের কাজও করতেন। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদের কাগজগুলোতে তিনি নিয়মিতভাবে লিখতে থাকেন এবং কমিউনিষ্ট ছাত্র সংগঠনে একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী হিসাবে কাজ করতে থাকেন। শিল্প ও সাহিত্যের বিশ্লেষণ-ধর্মী কাগজ, 'ভোর্বা'তে ১৯২৭ সাল থেকে একজন নিয়মিত লেখক হিসাবে লিখতে থাকেন। কাগজখানা সম্পাদনা করতেন এফ. এক্স. সাল্‌দা। ১৯২৯ সালে তিনি 'ভোর্বা'র প্রধান সম্পাদক হলেন এবং তাঁর সম্পাদনায় 'ভোর্বা', সাংস্কৃতিক পর্যালোচনার সর্বশ্রেষ্ঠ কাগজে পরিণত হোল। একই সময়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র, 'রুদে প্রাভো'র সম্পাদকমণ্ডলীরও সদস্য ছিলেন ফুচিক।

১৯২৯ সালে উত্তর বোহেমিয়ায় কয়লা খনির শ্রমিকদের যে এক বিরাট ধর্মঘট হয়, তা'তে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং বেআইনীভাবে খনিশ্রমিকদের কাগজ প্রকাশ করতে থাকেন।

১৯৩০ সালে এক শ্রমিক-প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে ফুচিক সোভিয়েত ইউনিয়নে আমন্ত্রিত হন। সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরোপীয় অংশ ও সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ছ' মাস পরে তিনি দেশে ফিরে যান এবং "দি কানট্রি হোয়্যার টু-মরো ইজ্ ইয়েস্টারডে" নামের সেই বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন।

একজন কমিউনিষ্ট, একজন সাংবাদিক, একজন বক্তৃতাকারী হিসাবে যেহেতু তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে সত্য কথাটি সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন, সেই জন্য চেক্ প্রতিক্রিয়া তাঁর পেছনে তাড়া করে বেড়াল এবং অবশেষে তাঁকে গ্রেপ্তার হ'তে হোল। ১৯৩৪ সালে 'রুদে প্রাভো'র প্রতিনিধি হিসাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি তাঁকে সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠাল। ১৯৩৬ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করে, তিনি পুনরায় 'ভোর্বা'র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং নতুন কমিউনিষ্ট দৈনিকের প্রধান সম্পাদকের দায়িত্বও গ্রহণ করলেন।

ক্রমে এগিয়ে এল ১৯৩৮ সাল। নাৎসীবাদের ঝোড়ো হাওয়া বইতে থাকল। ঘটল মিউনিখের ঘটনা। সমস্ত কমিউনিষ্ট পত্র-পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষিত হোল, চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টিকে ভেঙ্গে ফেলা হোল এবং শেষ পর্যন্ত গোটা চেকোশ্লোভাকিয়া নাৎসীদের দখলে চলে গেল।

পশ্চিম বোহেমিয়ার দোমাজ্‌লিচ্‌ অঞ্চলের এক ছোট্ট গ্রাম, ছোটিমার-এ বাধ্য হয়ে চলে যেতে হোল ফুচিককে। সেখানে সাহিত্য ও ইতিহাসের পড়াশুনায় ডুবে রইলেন তিনি। ১৯৪১ সালে, যখন চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম বেআইনী কেন্দ্রীয় কমিটিকে খুঁজে বার করতে গেস্টাপোরা সফল হোল, তখন নতুন বেআইনী কমিউনিষ্ট কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠকের দায়িত্ব নিলেন জুলিয়াস ফুচিক এবং অন্যান্য কমরেডদের সহযোগিতায় বেআইনী কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র ‘রুদে প্রাভো’ ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকাগুলো প্রকাশ করে চললেন তিনি।

১৯৪২ সালের এপ্রিলে গেস্টাপোরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হোল। অমানুষিক নিপীড়ন চলল তাঁর ওপর। গেস্টাপো পরিবৃত প্যানক্র্যাক্‌-এর বন্দীশালায় ফুচিক লিখলেন সেই মহান রচনা ‘নোটস্‌ ফ্রম্‌ দি গ্যালোস্‌’। ১৯৪৩ সালের জুনে তাঁকে বাউজেন্‌-এ স্থানান্তরিত করা হোল। ১৯৪৩ সালের আগস্টে বার্লিনের ভোক্‌স্‌গেরিখ্‌ট্‌-এর সামনে হাজির করা হোল তাঁকে। ১৯৪৩ সালের ২৫শে আগস্ট তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হোল। ১৯৪৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর বার্লিনে সেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হোল।

জুলিয়াস ফুচিক ছিলেন মহৎ মানবিক অস্তিত্বের এক ব্যক্তি-রূপ। সমস্ত শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ও বিশ্বের জাতিগুলির মধ্যে শান্তির স্বার্থে উৎসর্গিত-প্রাণ এক অনমনীয় অসম সাহসী যোদ্ধা ছিলেন জুলিয়াস ফুচিক।

১৯৫০ সালে জুলিয়াস ফুচিককে মরণোত্তর শান্তি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

পরিভাষা সংযোজনী ও টীকা

প্রথম অংশ

(১) ১৯৩৭ সাল নাগাদ একজন চেক্ শ্রমিকের সাপ্তাহিক গড মজুরী ছিল মোটামুটিভাবে ১৫০ চেক্ ক্রাউন।

(২) প্লানিকা—তৎকালীন একজন খ্যাতিসম্পন্ন চেক্ ফুটবল খেলোয়াড।

(৩) ১০০ হেলার ছিল ১ ক্রাউনের সমান।

(৪) ওস্ত্রোভা—চেকোশ্লোভাকিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়লা-খনি অঞ্চল।

(৫) বোয়েমিশ্ হুণ্ডে—চেকোশ্লোভাকিয়ার দেশীয় কুকুর।

দ্বিতীয় অংশ

(১) ইয়ার্ত্তু—মধ্য এশিয়ায় বসবাসকারী যাযাবর লোকজনদের ব্যবহৃত চামডার তাঁবু বিশেষ।

(২) বাসমাচ্—মধ্য এশিয়ার এক ধবণের দস্যুদলের সদস্যদের নাম। অক্টোবর বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে গৃহযুদ্ধেব কালে এই দস্যুরা প্রতিবিপ্লবে যোগ দিয়েছিল।

(৩) দেখান্—উজ্‌বেকিস্তান ও তুর্কিস্তানের কৃষক।

(৪) বাত্রাক্—মজুর।

(৫) কিশ্‌লাক্—মধ্য এশিয়ার গ্রাম।

(৬) ইয়াশ্‌মাক্ —মুখমণ্ডলকে আবৃত করাব জন্য মুসলমান মহিলাদের ব্যবহৃত আচ্ছাদন বিশেষ।

(৭) বেক্—তুর্কেস্তানের ভূস্বামী সম্প্রদায়ের সদস্য বিশেষ।

(৮) দোতারা—তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

তৃতীয় অংশ

(১) এফ. এক্স. সাল্‌দা--বিংশ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা সাহিত্য সমালোচক।

(২) 'নোটবুক'—সাল্‌দা-সম্পাদিত একটি চেক্ সাহিত্য-পত্রিকা।

(৩) "ডক্টর গোয়েবল্‌স্‌-এর প্রতি খোলা চিঠি"তে যে দু'টি কবিতাংশ উদ্ধৃত হয়েছে ; সেই দু'টির প্রথমটির রচয়িতা জান্‌ নেরুদা ও দ্বিতীয়টির রচয়িতা কারেল হাইনেক মাচা। জান্‌ নেরুদা (১৮৩৪-১৮৯১) ছিলেন একজন বাস্তববাদী কবি ও ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত সমালোচক। কারেল হাইনেক মাচা ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন মহান কবি ও লেখক।

পরিশিষ্ট

(১) 'ভোর্বা'—চেক্‌ সাহিত্য-পত্রিকা। কথাটির অর্থ 'সৃজন'।

(২) 'রুদে প্রাভো'—চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র। কথাটির অর্থ 'নতুন জীবন'।